বিলাত ভ্রমণ

প্রথম ভাগ

বিলাতের পথে

ডাক্তার শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক এম এ, এম ডি,

মূল্য দশ আনা

সূচী।

বিলাত ভ্রমণ

প্রথম ভাগ

বিলাতের পথে

ডাক্তার শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক এম এ, এম ডি,

মূল্য দশ আনা

প্রকাশক

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়,

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস,

২২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক মহাশয়ের নাম দেশ-বিশ্রুত; নানাগুণে তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁহার গুণপনার পরিচয় ইতিপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যপাঠকমাত্রেই তাঁহার প্রণীত "চীনভ্রমণ" কাহিনী এবং অন্যান্য সুললিত রচনায় প্রাপ্ত হইয়াছেন—সুতরাং নূতন করিয়া ইন্দুবাবুর পরিচয় অনাবশ্যক।

সুন্দর জিনিস চিরকালই সুন্দর; যে সেই সুন্দর জিনিসকে হাতে করিয়া তুলিয়া অন্যকে উপহার দিতে পারে তাহারই পরম সৌভাগ্য। এ ক্ষেত্রে আমিও ইন্দুবাবুর ভাবসৌন্দর্য্যের বহনভার এবং সাধারণসমক্ষে তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করিতেছি। আলোচ্য গ্রন্থে যাহা সুন্দর বলিয়া আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছে পাঠকের সম্মুখে আমি তাহাই সংস্থাপন করিব—পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন তাহা যথার্থ সুন্দর কি না।

ইন্দুবাবুর রচনায় একটা আবরণহীন স্বচ্ছ সরলভাব আছে যাহা প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোথাও ভাষার অনাবশ্যক আড়ম্বর নাই, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিবার চেষ্টা নাই—কষ্টকল্পনামাত্রও নাই, ইন্দুবাবু যাহা বলেন তাহা সোজা গিয়া পাঠকের প্রাণে লাগে। দুঃখের অকপট একবিন্দু অশ্রুপাতে যে ভাব ব্যক্ত হয় কৃত্রিম সহস্র চীৎকার ক্রন্দনধ্বনিতেও তাহা হয় না। ইন্দুবাবুর রচনা এই স্বাভাবিক সরল সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল।

ছোটখাট বিষয়গুলিকে ফুটাইয়া তুলিতে, ভাবসৌন্দর্য্যে মণ্ডিত

করিতে ইন্দুবাবু অদ্বিতীয়। সাধারণতঃ যাহা আমাদের চক্ষু এড়াইয়া যায় ইন্দুবাবু তাহাতে সৌন্দর্য্য দেখেন এবং নানাভাবে সমস্ত প্রাণ দিয়া তাহাকে ব্যক্ত করেন। জীবনের সামান্য সামান্য ঘটনা সুখদুঃখের ছায়ালোকপাতে অনেক সময়ে আমাদের অন্তরে এমন্ একটি ভাবের লহরী ছুটাইয়া দেয় যাহা জগতের ইতিহাসের অতি বৃহৎ ঘটনায়ও আমরা উপলব্ধি করি না। শিশুর খেলাধূলা হাসিকান্না, জননীর স্নেহচুম্বন স্নেহদৃষ্টি, যুবকযুবতীর সামান্য সম্ভাষণ আলাপনের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য আছে তাহা ভাবোদ্দীপনায় অনেক সময়ে আগ্রার তাজ কিম্বা ঈজিপ্টের পিরামিড্‌কেও পরাভব করে। এই সৌন্দর্য্য অবলোকন, ইহার অনুভূতি এবং ইহার প্রকাশ-ক্ষমতাতেই ইন্দুবাবুর কৃতিত্ব। গ্রন্থের নানাস্থল উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে ইন্দুবাবুর এই কৃতিত্বের অনেক পরিচয় দিতে পারিতাম, কিন্তু বাহুল্যভয়ে কেবলমাত্র গ্রন্থের প্রারম্ভের একস্থল উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম। গ্রন্থের ৪এর পৃষ্ঠায় আছে—

"বন্দরে পৌঁছিবামাত্রই একটি অতি মনোহর সুরে বিদেশীয় ভাষায় গান শুনিলাম 'টারারারা ডম্ বি আই'—'টারারারা ডম্ বি আই'।

"এর মানে কিছু জানি না, তবে ক্যাবিনের জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম,—কতকগুলি কালো কালো নগ্নমূর্ত্তি ছেলে ছোট ছোট ভেলায় চড়িয়া ঐ গানটি গাইতে গাইতে এবং বগল বাজাইতে বাজাইতে আমাদের দিকে আসিতেছে। আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে দেখিতে শুনিলাম বলিতেছে—All right Mamma—2-anna bit, 4-anna bit Mamma—throw water little boy swim take'—অর্থাৎ, দু-আনি সিকি আপনারা মা জলে ফেলিয়া দিন, আমরা ছোট ছেলেরা সাঁতার দিয়ে তাহা তুলিয়া লইব।' অনেকে ফেলে দিতে লাগ্‌লেন আর তাহারা ডুব দিয়ে মাছের মত সাঁতার দিতে দিতে তুলে নিতে লাগিল; একটিও হারাল না।

উঁচু থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে লাগিল। যা সিকি দু-আনি পায়, মুখের ভিতর জিবের তলায় রাখে।" ইত্যাদি।

অন্য কেহ হইলে এই ঘটনাটিকে সামান্য তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে উপেক্ষা করিতেন, কিন্তু ইহার মধ্যে যে একটি স্বাভাবিক সরল সৌন্দর্য্য আছে তাহা ইন্দুবাবুর সূক্ষ্মদৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে নাই।

প্রাকৃতিক দৃশ্যবর্ণনায়ও ইন্দুবাবুর কবিত্ব তাঁহার লেখনীমুখ হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। এখানেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরলতা পরিস্ফুট।

ইন্দুবাবুর রচনার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার রচনায় কোথাও সঙ্কীর্ণতা নাই। তিনি সমস্ত জগতটাকে একটা দেশকালাতীত সার্ব্বজনীন উদারতার চক্ষে দেখেন। দেশাচার বা লোকাচারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে দাঁড়াইয়া তিনি এই বিশ্বজগতটাকে দেখিয়াছেন বলিয়াই পৃথিবীর যাহা কিছু ভাল যাহা কিছু সুন্দর তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছে এবং তাঁহার সূক্ষ্ম সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে। সাহিত্যে এরূপ নিরপেক্ষ ভাবগ্রাহিতা, এরূপ বিশ্বজনীন উদারতা দুর্লভ।

নারীজাতির প্রতি ইন্দুবাবুর অন্তরের একটি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দেখা যায়। নারীজাতির অবস্থা, নারীজাতির শিক্ষা, নারীজাতির উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা গ্রন্থের নানাস্থলে নানান্‌ভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে,—নারীজাতির প্রসঙ্গমাত্রেই ইন্দুবাবুর অন্তর যেন ভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

ইন্দুবাবু একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং কবি; সুতরাং, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানসমূহের বর্ণনা এবং বিভিন্ন দেশের আচার ব্যবহার, রীতিনীতির আলোচনা তিনি যেরূপভাবে করিয়াছেন তাহা একপ্রকার তাঁহার দ্বারাই সম্ভব। ইন্দুবাবুর সহিত অনেকের মতানৈক্য থাকিতে পারে, আমারও অনেক বিষয়ে তাঁহার সহিত মতের ঐক্য নাই, কিন্তু তথাপি ইন্দুবাবুর চিন্তাশীলতা, গবেষণা ও তাঁহার সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির শতমুখে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

পরিশেষে বক্তব্য অনবধানবশতঃ গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভাষায় অপ-প্রয়োগ ও অন্যান্য ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। প্রুফ্‌টি আরও মনোযোগের সহিত দেখিলে ভাল হইত। আশা করি গ্রন্থকার বারান্তরে এই ক্রটি সংশোধন করিয়া গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবেন। ইতি

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিষম সমরবিজয়ী পঞ্চশ্রীযুক্ত শ্রীমৎ মহারাজ

বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর।

মহারাজ বঙ্গসাহিত্যের বড়ই আদর করেন, ও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়িতে বড়ই ভালবাসেন, জানিয়া আমার এ "বিলাত ভ্রমণ"খানি মহারাজের পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীইন্দুমাধব।

সূচী।



কৃষক ও কৃষকবধূর মাঠে সন্ধ্যা-উপাসনা।

বিলাত ভ্রমণ।

বিলাতের পথে।

সাতবৎসর পূর্ব্বে যখন চীনভ্রমণে যাই তখন হইতেই বাসনা ছিল যে সর্ব্বাপেক্ষা দেখিবার ও শিখিবার স্থান সুদূর ইউরোপও একদিন দেখিব। দেশ ভ্রমণের যে কি আনন্দ ও কি শিক্ষা তা আমাদের দেশে অনেকেই জানেন না, তাই আত্মীয় বন্ধুবা বাধা দিতেন। সেই কারণে কতবার যাইবার উদ্যম করিয়াও বাহির হইতে পারি নাই। এবার কতক সুবিধা বুঝাতে বিলাত যাত্রা করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়া, কাহাকেও সে কথা ঘুণাক্ষরে না জানাইয়া দিনস্থির ও জাহাজ ঠিক করিলাম।

তখন গ্রীষ্মকাল। সে সময়ে সকল ইংরাজ কর্ম্মচারীরা ছুটী লইয়া ও ভ্রমণকারীরা বিদেশ পর্য্যটন করিয়া বাটি ফিরেন বলিয়া জাহাজে স্থান পাইতে বড়ই দেরী হয়। অতি কষ্টে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর "স্থান" ঠিক করিয়া "পি এন্ ও কোম্পানীর" "শীমলা" নামক জাহাজে উঠিলাম। ২৮শে মার্চ্চ তারিখে প্রাতে ছয়টার সময় হাইকোর্টের ঘাটে জাহাজে চড়ি। এবং চড়ায় লাগিবার ভয়ে জাহাজ নদীর ভিতর অতিশয় আস্তে আস্তে ও সাবধানে চলে বলিয়া সে দিন সারাদিনই ভাগীরথীর বক্ষে ভাসিয়া পরদিন প্রত্যূষে সমুদ্রসঙ্গমে পৌছাই।

ক্রমেই নদীটি প্রশস্ত হইয়া এখন দুকূল আর দেখা যায় না।

এখনও ঘোলা-নদীর ময়লা মাটী আসিয়া নীল সমুদ্রজলে পড়িতেছে বলিয়া জলের রঙ সবুজ। ক্রমে বঙ্গোপসাগরের আরও বাহিরের দিকে অপার অনন্ত জল কেবলই ঘোর নীল। চারিদিকে সে নীলিমা সুদূর নীল আকাশ অবধি প্রসারিত।

এখান হইতে কলোম্বো পৌঁছাইতে ছয় দিন লাগে, এই কয়দিন জল ও আকাশ ছাড়া বাহিরে আর কিছুই দেখিবার নাই। তবে জাহাজের ভিতর দেখিবার অনেক আছে। সে সংকীর্ণ স্থানে লোকে লোকারণ্য। কেবল রাত্রিকালে নিজ নিজ কেবিনে ও তিন বার আহারের সময় ভোজনস্থলে যাওয়া ছাড়া সর্ব্বদাই সকলের সঙ্গে ডেকের উপর দেখা হয়। সেখানে সবাই পাশাপাশি আরাম কেদারা প্লাতিয়া বসিয়া থাকে, আর পরস্পরের সহিত গল্পগুজব বা পড়াশুনা করে। এক একবার উঠে পায়চালি চলে। অত সংকীর্ণ সেই স্থানেও সুব্যবস্থায় কতটা লাফালাফিও চলিতে পারে। তা ছাড়া পড়িবার ঘরও আছে। সেখানে কাগজ ও বই আছে ও লিখিবার সরঞ্জাম সব সাজান। তবে পিয়ানো সংযোগে গান বাজনা নাচা ইত্যাদি আমোদ সর্ব্বাপেক্ষা সকলেরই প্রিয়। প্রায় প্রতিদিন ৭টার সময় সন্ধ্যা ভোজনের পর সেইরূপ আমোদ হইত।

সকল লোকেই সেখানে আলাপ করিতে ব্যস্ত, আলাপও সেখানে সহজেই হইয়া যায়। রমণীদের এইরূপ জনতার স্থানেই সাজসজ্জাও বিভ্রমের উপযুক্ত সময়। দিনে দিনে কত রকমেরই বেশ পরিবর্ত্তন হইত। ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি সব সেখানে শুধুপায়ে থাকে। সকলেরই দেখা যায় স্বাধীন আনন্দময় ভাব। সকল প্রকম দুশ্চিন্তা ও অশান্তি অমন জনতায় ও আনন্দের মাতামাতির স্থানে ভুলিয়া যাইতে হয়। আর উন্মুক্ত নির্ম্মল বায়ু সেবন করিয়া শরীরে কত স্বাস্থ্য আসে। সুনিদ্রার তো কথাই নাই। এঞ্জিনের অস্পষ্ট মধুর শব্দ শুনিয়া ও ঢেউয়ের

বশে দোদুল্যমান জাহাজ খানিতে শুইয়া যেন মার কোলে দুলিতে দুলিতে স্বর্গের ঘুম আসে। সে নির্ব্বিকার স্বপ্নহীন ঘুম।

এইরূপে—

"ধূধুধূধু বারিরাশি হুহুহুহু গান।
তারই মাঝে হারায়ে ফেলে মুগ্ধ সবল প্রাণ॥"

পাঁচদিন অতিবাহিত করিয়া আমরা ছয় দিনের দিন প্রত্যুষে কলম্বো বন্দরে পৌঁছাইলাম।

কলম্বো।

কলিকাতা হইতে সারাপথ জাহাজে করিয়া বিলাত যাইতে হইলে, প্রায় সমস্ত সিংহল বা লঙ্কাদ্বীপটি প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতে হয়। লঙ্কাদ্বীপের রাজধানী কলম্বোতে পৌছিবার প্রায় দুই দিন পূর্ব্বে হইতে লঙ্কাদ্বীপের পাহাড় ডান দিকে দেখা যাইতে থাকে। সমুদ্রের ধারটি প্রায় সবই পাহাড়ময়। ২রা এপ্রিল প্রাতে ৭টার সময় আমরা কলম্বো বন্দরে পৌছিলাম। বন্দরে ঢুকিতেই একটি অতি বিস্তীর্ণ পাথরের প্রাচীর সমুদ্রজলের মধ্য হইতে গাঁথা আছে দেখা যায়। এইটিকে "ব্রেক্ ওয়াটার" (Breakwater) বলে। সমুদ্রের ঢেউ আসিয়া যাহাতে বন্দরের মধ্যস্থিত জাহাজে না লাগিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে এই প্রাচীর গাঁথা। মলয় ও চীনদেশে কোন বন্দরে আমি এরূপ দেখি নাই। তাহার কারণ, সে সকল স্থানে বন্দরের ঠিক সাম্‌নেই অন্যান্য ছোট ছোট দ্বীপ থাকাতে বাহিরের ঢেউ আটকাইবার জন্য আর অন্য কিছু গাঁথিতে হয় না। বন্দরের নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানে আলোক-স্তম্ভ নির্ম্মিত আছে। বন্দরের ভিতর কত রকমের অর্ণবপোত ও ছোট বড় নৌকা ও ষ্টীমলঞ্চ থাকে। কিন্তু চীন ও মলয়ের মত এত যুদ্ধের জাহাজ এখানে দেখিলাম না। সেখানে অত রণতরীর থাকার কারণ বোধ হয় তখনকার রুষ-জাপানের যুদ্ধ। এখানকার দেশীয় নৌকাগুলি কলিকাতার পান্‌সি হইতেও পরিপাটি ও ক্যাম্বিশের ছাদ দিয়া ঢাকা। এখানে রৌদ্র বড় প্রখর বলিয়া ঐরূপ করিতে হয়। দূর হইতে বন্দরের বাড়ী-ঘরগুলি দেখা যাইতে লাগিল— তাহার অধিকাংশ একতোলা ও লাল খোলার ঢালু ছাদ যুক্ত।

বন্দরে পৌছিবামাত্রই একটী অতি মনোহর সুরে বিদেশীয় ভাষায়

এর মানে কিছু জানি না, তবে ক্যাবিনের জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম,—কতকগুলি কাল কাল নগ্নমূর্ত্তি ছেলে ছোট ছোট ভেলায় চড়িয়া ঐ গানটি গাইতে গাইতে এবং বগল বাজাইতে বাজাইতে আমাদিগের দিকে আসিতেছে। আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে দেখিতে শুনিলাম বলিতেছে—

"All right Mamma—2-anna bit, 4-anna bit Mamma—throw water little boy swim take"—অর্থাৎ দুয়ানি সিকি আপনারা মা জলে ফেলিয়া দিন, আমরা ছোট ছেলেরা সাঁতার দিয়ে তাহা তুলিয়া লইব।" অনেকে ফেলে দিতে লাগিলেন, আর তাহারা ডুব দিয়ে মাছের মত সাঁতার দিতে দিতে তুলে নিতে লাগিল; একটিও হারাল না। অনেকে জাহাজের মাস্তলের উপর উঠে প্রায় একশত ফুট উঁচু থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে লাগিল। যা সিকি দুয়ানি পায়, মুখের ভিতর জিবের তলায় রাখে। তা ছাড়া আর ত সেখানে কোথাও ভাল রাখবার জায়গা নাই। তাদের এমন সুস্থ শরীর যে দেখলে পরে মনে হয় যেন কালো পাথর হতে খোদা প্রতিমূর্ত্তি। এই রকম দৃশ্য আমি মলয় দেশেও দেখিয়াছিলাম।

বিদেশে বেড়াইতে আসিয়া পয়সার মায়া করিলে দেশ দেখা হয় না। যে যে দেখিবার জিনিব আছে, তাহা অল্প সময়ের মধ্যে ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে হইলে, "গাইড" বা পথ-দর্শক চাই। এইরূপ একজন লোক ও একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা চলিলাম।

প্রথমেই পোষ্ট আফিসে গিয়া খানকতক চিঠি লিখিলাম। এখানে টাকা আধুলি সিকি অবধি চলে, দুয়ানি চলে না। তবে এখানকার প্রচলিত মুদ্রা টাকা ও সেণ্ট। একশত সেণ্টএ এক টাকা হয়। এইরূপ পাঁচ সেণ্টএ ডাকটিকিট ও তিন সেণ্টএ পোষ্টকার্ড পাওয়া যায়।

[illegible] ... হইতে জাপান, চীন, মলয় বা

অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যাইতে কলম্বো হইয়া যাইতে হয়। সেই কারণ এখানে অনেক বড় বড় জাহাজ লাগে ও সেইহেতু এই স্থানটি একটি বড় বন্দর। ডাঙ্গায় নামিয়া দেখিলাম, দোকানপাটে সমুদ্রের ধারের স্থানগুলি ভরা। রাস্তাগুলি চওড়া পরিষ্কার ও পাহাড়ে স্থানের মত উঁচু-নীচু। দুইধারে বড় বড় পাথরের বাড়ী অল্প সংখ্যক মাত্র আছে, অন্য সবগুলি একতোলা ও ঢালু ছাদের। গবর্ণরের প্রাসাদ ঠিক সমুদ্রের ধারেই একটি অনুচ্চ পাহাড়ে অবস্থিত। সহরের প্রায় চারিদিক হইতেই সমুদ্র দেখা যায়। সহরের ভিতরে মধ্যে মধ্যে বড় বড় মিষ্ট জলের হ্রদ আছে। সেগুলি আর কিছুই নয়—বড় বড় দীর্ঘিকার মতন। বর্ষার জল পাহাড়ের গাত্র হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া এ গুলিতেই আবদ্ধ থাকে। জল লোনা নয় বলিয়া এই জলে দেখিলাম ধোপারা কাপড় কাচিতেছে, আর স্ত্রীলোকেরা কল হইতে কাজ করিয়া আসিয়া সাবান দিয়া গা ধুইতেছে।

কলম্বো কলিকাতা হইতে অনেক ছোট সহর। বন্দর হইতে একটু ভিতরে যে সকল থাকিবার বাড়ী আছে, সেগুলি সব বাগানযুক্ত ও অনেকটা জমি লইয়া ঘেরা। সেই সকল স্থানই ধনীলোক ও সাহেবদের থাকিবার স্থান। ঠিক যেন কুঞ্জবনের মতন। এ সকল দেশে সব গাছই সতেজে জন্মায়। গাছগুলির ঘন পাতায় এমন সবুজ রঙ্ যে, আমাদের দেশে তেমন বড় একটা দেখা যায় না। আর তাদের ফুল ও ফল তেমনি বড় বড় ও সুন্দর! একটি সৌখীন লোকের বাগানে দেখিলাম, সমস্ত স্থান নানা-প্রকার ফুলে ভরা। সে পথ দিয়া গেলে, সুগন্ধে প্রাণ আমোদিত হয়, চোখ জুড়ায়। এইখানেই গাছের শীতল ছায়ায় বসিয়া মধুর স্বরে কত কি পাখী ডাকিতেছিল। আর সেখানে অবিরল ঝিল্লিরব শুনা যায়। তাতে সে নির্জ্জন স্থানে মনে এক অনির্ব্বচনীয় শান্তির ভাব আসিতেছিল। বড়ই ইচ্ছা হইতেছিল, আরও খানিক বসিয়া যাই।

হয় এখানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহা নহে। কেন না পাথরের দেশ; আমাদের বঙ্গভূমির মত এ স্থান ভিজে মাটী নয়। সকল গাছগুলিই বড় বড় আকৃতিবিশিষ্ট—ছোট আগাছা নহে। এখানকার নারিকেল গাছগুলি খুব বড় ও ফলও তদুপযুক্ত। এমনি নারিকেল গাছ আমি পেনাঙ্গে দেখিয়াছিলাম। আম এখানে বারমাসই পাওয়া যায়। কলাও খুব বড় বড় হইয়া থাকে। পান গাছ যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। সবই সুগন্ধযুক্ত ছাচি পান। "ব্রেডফুরুট" (Bread fruit) বলিয়া একপ্রকার গাছ আছে, শুনিলাম তাহার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লেবুর মতন বড় বড় ফলগুলি অতি সুখাদ্য। এমন আনারস ও পেঁপে কোথাও দেখি নাই। আমাদের দেশের ঐ ফলগুলির অপেক্ষা এ ফল অন্ততঃ তিন চারিগুণ বড় ও অনেক পরিমাণে সুমিষ্ট। বটগাছগুলি সব বহুদূরব্যাপী অসংখ্য মোটা মোটা জটা নামাইয়া অনেকটা স্থান জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর বাঁশ গাছের তো কথাই নাই—যেমন মোটা মোটা তেমনি সুন্দর ও সোজা তার পাপরিগুলি। এ সকল ছাড়া চা কফি প্রভৃতি অন্যান্য অনেক দ্রব্য এখানে বহু পরিমাণে জন্মায়। লিপটনের খুব একটি বড় চার কারখানা এই সহরের ভিতরেই আছে। তা ছাড়া একটি বড় "গ্রেফাইট" বা সীসার কারবার আছে। সেখানে অসংখ্য স্ত্রীলোক কাজ করে। আমরা যখন আসিতেছিলাম, তখন তাহারা ছুটি পাইয়া মলিন বসনে বাড়ী যাইতেছিল।

এখানকার লোকেরা বড় গরীব, ও বড়ই অশিক্ষিত। অনেকে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। স্ত্রীলোকেরা লুঙ্গি পরে ও একটি গলা-ফাঁক "বডি" গায়ে দেয়। মাথায় ঘোমটা নাই, আর স্তনের উপরকার অংশ অর্দ্ধেকটা বাহির করিয়া রাখিতে ভালবাসে।

পরে, কোট গায়ে দেয়। দাড়ি গোঁপ রাখে, আবার মাথায় খোঁপাও বাঁধে ও তাহাতে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে বাঁকা চিরুনি গুঁজিয়া রাখে। কেহই সবল সুস্থ বা হাসি মাখা মুখ নয়—কেন য়ে এমন কে জানে?

স্থানটি যেমন ছোট তেমনি এখানে দেখিবার জিনিষও অতি অল্পই আছে। ভিক্টোরিয়া পার্কের ঘাসযুক্ত খোলা ময়দানটি ঠিক যেন সবুজ সতরঞ্চি পাতা। সেখানে ছোট ছোট গাছ নাই, মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ আছে। জমিটি উঁচু-নিচু। সেখানকার জলনিকাশ হইয়া মাঝে মাঝে এক একটি মিষ্ট জলের বড় বড় দীর্ঘিকা হইয়াছে। সেখানেও সেই পাখীর গান—সেখানেও সেই অবিশ্রান্ত ঝিল্লিরব। চারিদিকের দৃশ্যে কেমন একটু নির্জ্জন মধুর ভাব আছে।

অনতিদূরেই কলম্বোর মিউজিয়ম। সেখানে আশেপাশে অনেকগুলি গবর্ণরের শ্বেতপ্রস্তর মূর্ত্তি আছে। সে সকল গুলিরই দেখিলাম তেজঃ-পূর্ণ উদ্দীপ্তভাব। একটিরও দয়া দাক্ষিণ্য বা কোমলতা মাখান ভাব নহে। যেন তাদের পদতলে পড়িয়াই সিংহলবাসীর অমন ম্লান মুখশ্রী হইয়াছে।

মিউজিয়মের ভিতর নীচের তলায় প্রত্নতত্ব ও স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের অনেক জিনিষ সুব্যবস্থায় সাজান আছে। ঘরে ঢুকিয়াই নানাপ্রকার নৌকা ও তদুপযোগী দ্রব্যাদির প্রতিকৃতি একধারে সাজান আছে। সে যে কত রকমের, তা বলা যায় না। কোন কোনটি বা কেবল কতকগুলি সোজা সোজা কাঠ দিয়া প্রস্তুত—ঠিক যেন ভেলার মত। কোনটি বা আরও ভাল রকমের কামরাওয়ালা নৌকার মতন। সবগুলি সরু ও দ্রুতগতির উপযুক্ত। নানারকমের পাল, নানা রকমের দাঁড় ও লগি এবং মাছ ধরিবার জাল। আর একধারে সিংহলে মুক্তা তোলার ছবি সাজান আছে। কাল কাল নগ্ন মানুষগুলি ঝুড়ি লইয়া দড়ি ধরিয়া, জলে ডুব দিতেছে। কোনটী বা মুক্তা কাঠিবার অবস্থা, কোনটি বা উঠিবার অবস্থা, সব গুলিই অতি সুন্দর বটিত।

তার আর এক পাশে তাল ও নারিকেল গাছ হইতে যত রকম দ্রব্য হইতে পারে সেই সব রক্ষিত। গাছের গুড়ি হইতে নানারূপ কাঠের দ্রব্য ডোঙ্গা ও বরগা। পাতা হইতে কত রকম ঠোঙ্গা, চ্যাটাই, ছাতা, টোকাও লিখিবার তালপাতা। ছোবরা হইতে দড়ি ম্যাটিং বুরুষ ইত্যাদি। নারিকেল পাতার কাটি হইতে ঝাটা ঝারন। খোলা হইতে হুকা ও নানা প্রকার পাত্র। শাঁশ হইতে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন, তেল হইতে বাতি, সাবান ইত্যাদি। তালের রস হইতে গুড়, চিনি, মিছরি ও মদিরার মত নানা জাতীয় পানীয় প্রস্তুত রহিয়াছে।

আর এক পাশে মালদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও তাহাদের পূজা করিবার দেবতা। সে দেবতাগুলি অতি ভীষণ দর্শন। অনেকেরই মুখ জলজন্তুর মত। কেহ কেহ বা আস্ত মানুষ ধরিয়া খাইতেছে। সে মনুষ্যজাতির শৈশব অবস্থার ভীষণ কল্পনার ছবিগুলির কথা ভাবিলে এখনও অবধি মনে ভয় হয়।

পাশের ঘরে একদিকে পুরাকালের ও আধুনিক নানাজাতীয় মুদ্রা সাজান আছে। অতি প্রাচীনকালের মুদ্রাগুলি কেবল এক একটি লোহার বা তাঁবার খণ্ডমাত্র। তার অনেক পরে সুগঠন ও ছাপামারা ধাতু মুদ্রা আসিয়াছে। মুদ্রাগুলি সাজানতে যেন মনুষ্যজাতির সভ্যতার ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তি স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে।

তাহার পাশেই পাথরের, হাতীর দাঁতের, ও চন্দন কাঠের খোদাই কাজ। এ সকল দ্রব্যই সিংহলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সকল গুলিতেই বুদ্ধপ্রাণ সিংহলবাসীরা বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি নানা ভাবে খুদিয়াছে। আর নানা স্থানের বুদ্ধলিপি খোদিত পুরান পাথরগুলিও ইংরেজ রাজ সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন।

যেমন নীচের তলায় প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কীয় জিনিষ রক্ষিত আছে, তেমনি

তার মধ্যে জলজ প্রাণী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তা হবেই ত—সিংহল সমুদ্রতীরের দেশ কি না, তাই এখানে যত প্রকার নৌকার প্রতিকৃতি জলজ প্রাণীদেহের বাহুল্য দেখা যায়। ছোট বড় নানা আকৃতির ও নানা বর্ণের কত প্রকার মাছ। বিদ্যুৎ উৎপাদক "রে" ও "টরপেডো" সূচিমুখ মৎস্য বিশেষ ও লম্বা ল্যাজযুক্ত শঙ্কর মাছ। "ডিউডঙ্গ" শুশুকেরই জাতীয়—তাহারা মৎস্য নয়, সন্তানকে দুগ্ধপান করায়। বৃহদাকায় একটি ঐ জন্তু ও তাহার এক ছানা একত্র রক্ষিত রহিয়াছে। আর তার তলায় লেখা যে, ছানাটিকে ধরাতে মাও আসিয়া আপনি ধরা দিল।—এ রকম অধম জীবেরও এত সন্তান স্নেহ। তা ছাড়া নানা জাতীয় "কোয়াল" "স্পঞ্জ" ও "হাইড্রয়েট"ও আছে; একটি কফি গাছের উপর একটি প্রজাপতি এমন সুন্দরভাবে বসেছে—ঠিক যেন কফিগাছেরই পাতার মত। কে তাকে চিনবে প্রজাপতি ব'লে।—দেখিলাম পাখা দুখানি যেন কফিপাতা, আর ধড়টি যেন বোঁটা, আর গায়ের রঙ ঠিকই কফিপাতারই মত। প্রাণীরা শত্রুর চক্ষে এমনি করিয়া ধুলা দিয়াই এই বিপদ সঙ্কুল জগতে আত্মরক্ষা করে। এইরূপ অনুকরণই (mimicry) ডারউইনএর অভিব্যক্তিবাদের মহা পরিপোষক। অর্থাৎ অবস্থানুসারে নিজেকে গড়িয়া লইতে না পারিলে মরিতে হয়।—কি প্রাণীর বেলা, কি মনুষ্যজাতির বেলা এ নিয়ম সকলের পক্ষে সমান প্রযুজ্য।

মিউজিয়ম হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া সেই স্থানের বাজার দেখিতে চলিলাম। কেনা-বেচার জায়গায় লোকের আবশ্যক অনাবশ্যকের জিনিষ দেখিলে সেখানকার লোকের প্রকৃতি বুঝা যায়। এই জন্যেই আমি যে দেশেই বেড়াতে যাই না কেন, দেশের বাজার ও স্থানীয় লোকদের বসতিস্থান না দেখিয়া ফিরি না। যাইতে যাইতে দেখিলাম, পথে পানওয়ালীরা পান বেচিতেছে—আস্ত আস্ত পান ও খানকতক কলে সুপারি

প্রভৃতি সুন্দর ফল বিক্রয় হইতেছে। সে রকম আকৃতিবিশিষ্ট ও সে রকম মিষ্ট ফল আর কোথাও দেখি নাই। অনেকগুলি কিনিয়া জাহাজে আনিলাম ও আনিবার সময় আমাদের বাড়ীর ছেলেদের কথা মনে হইতে লাগিল। পিপাসা হওয়াতে ডাব খাইলাম। সে হলদে হলদে ডাবগুলিকে তাহারা "রাজার ডাব" (King Cocoanut) নাম দিয়াছে। তাতে ছোবড়া নাই—এত নরম যে পেনকাটা ছুরি দিয়া কাটা যায়। এক একটিতে একটি গ্লাস ভরে জল। আর কি যে সুমিষ্ট, তা বলে বুঝান যায় না। তৃপ্তির সহিত আকণ্ঠ পান করিয়া দাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিল,—এক একটি চারি আনা।

এখানে অনেক রকম যানবাহন দেখিলাম। মানুষে টানা রিক্স গাড়ী আছে, তাহা ঠিক দ্বিচক্র ছোট হালকা বগি গাড়ীর মত ও খুব দ্রুত চলে। দু চাকার ঘোড়ার গাড়ী ও চার চাকার ঘোড়ার গাড়ী অসংখ্য পাওয়া যায়—তাদের সব কলিকাতার গাড়িভাড়া হইতে ভাড়া সুবিধা। ছতরিওয়ালা গরুর গাড়ী আছে, সে আরও সস্তা ও গরু গুলি অনেক সুস্থ ও সবল। তা ছাড়া বৈদ্যুতিক ট্রাম চলে, তার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ১০ সেণ্ট মাত্র ভাড়া। তবে মোটের উপর কলিকাতা হইতে লোকসংখ্যা ও গাড়ী যাতায়াত কম বলিয়া রাস্তাগুলিও ভাল থাকে।

এখান হইতে সে স্থানের আদৎ দেশীয় লোকেরা যে পাড়ায় বাস করে, সেই স্থান দেখিতে চলিলাম। সেই সকল স্থান আমাদের কলিকাতার রাস্তার মতন অপরিষ্কার নয়। পূর্ব্বেই স্ত্রীলোকদের ও পুরুষদের বেশভূষার কথা বলিয়াছি। তাহারা খুবই গরীব ও খুবই দুরবস্থাগ্রস্থ বলিয়া মনে হইল। কিন্তু যে কারণেই হউক, আমাদের থেকে খুব পরিষ্কার।

এখান হইতে আসিতে আসিতে ওলন্দদের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ

কেবল একটি ধ্বংসপ্রায় সমাধিক্ষেত্র ও একটি বৃহৎ ঘণ্টা উচ্চে টাঙ্গান আছে। পূর্ব্বে এ সব অঞ্চলে ওলন্দাজদের প্রাধান্য ছিল ; এখনও তাহারা যব প্রভৃতি দ্বীপের রাজা। সিংহল দ্বীপে মৃতজনের অস্থি ছাড়া আর তাঁহাদের এখন কিছুই নাই।

ইহারই অনতিদূরে এক বিস্তীর্ণ সরোবরের তীরে একটি ছোট বৌদ্ধ-মন্দির দেখিতে গেলাম। সে মন্দিরটি লোকালয় হইতে দূরে এক নিভৃত স্থানে, চারিদিকের বড় বড় গাছের দ্বারা আচ্ছাদিত। বহুদিনের পুরাতন প্রাচীরগুলি ভাঙ্গা ও মন্দিরটি অযত্নে রক্ষিত। সেখানে অনেকগুলি ছাঁচি পানের গাছ আছে। যাঁহারা মন্দির দেখিতে যান, তাঁহারা স্বেচ্ছায় এক একটি পাতা ছিঁড়িয়া দেবতার প্রসাদ মনে করিয়া মুখে দেন। তা ছাড়া সে বৌদ্ধমন্দিরের ভিতর নৈবেদ্য বা শঙ্খ ঘণ্টা কিছুই নাই। ছেঁড়া গেরুয়া বসন পরিহিত সেখানকার বৌদ্ধপুরোহিতেরা অতিশয় গরিব। তাঁহারা তাঁহাদের ইষ্টদেবকে তাল পাতার পুথি পড়িয়া পূজা করেন। বুদ্ধদেবের জন্মবৃত্তান্ত, গোপার পদ্মপত্র হইতে আবির্ভাব, বুদ্ধের ধ্যানস্থ প্রতিমূর্ত্তি ভক্তেরা তাঁদের দেবতার মূর্ত্তি কত বিভিন্নরূপেই কল্পনা করিয়াছেন।

মন্দিরের সামনেই একটি ধর্ম্মপ্রচার করিবার স্থান। তার চারিদিকেই শ্রোতারা বসেন, আর মধ্যের এক উচ্চ বেদীতে পুরোহিত বসিয়া ধর্ম্ম-উপদেশ দেন। তার পাশেই একটি ভগ্ন উচ্চ মন্দিরচূড়ায় একটি বড় ঘণ্টা ঝুলান আছে—সন্ধ্যা-উপাসনার সময় এই ঘণ্টার রবই দূর হইতে সকলকে আহ্বান করে। আর তার পাশেই এক উচ্চ স্থানে আলো দিবার ব্যবস্থা। সে আলোটি এখন অযত্নে অতিশয় নিষ্প্রভ। বিশ্বভুবন যে আলোয় আলোকিত হইয়াছে, তারই একটি ছোট মিটমিটে প্রতিকৃতি।

আমিও সেই প্রসাদ তরুর তলায় দিয়া আসিবার সময় একটী পানপাতা

তালপাতার পুথি হইতে একটি পাতা সঙ্গে আনিলাম। তার সার মর্ম্ম আর একটা কাগজে ইংরাজিতে তর্জ্জমা করিয়া ছাপা ছিল—তা এই,—

"এই বুদ্ধের ধর্ম্ম—এই প্রভুর আজ্ঞা।"

১। "জীব হত্যা করিও না—যে প্রাণ দিতে পার না সে প্রাণ নিও না।"

২। "দুটী দ্রব্য একান্ত বর্জ্জনীয়—অসত্য ও হিংসা।"

৩। "উনি আমার নিন্দা করিয়াছেন, উনি আমার উপর অন্যায় আচরণ করিয়াছেন, উনি আমার ক্ষতি করিয়াছেন—এইরূপ প্রকার রাগের কথাগুলি যদি লোকে নিজের অন্তরে অন্তরে পুষিয়া রাখে, মনুষ্যত্বের সংসার হইতে কথনই দূর হইবে না।

"এই বুদ্ধের ধর্ম্ম—এই প্রভুর আজ্ঞা"

কেবল এই কয়টি কথা, আর কিছুই লেখা নাই। বোধ হয় তার মানে এই কটিতেই পৃথিবীর জাতীয় ধর্ম্মতত্ত্ব নিহিত আছে।

এডেন্ বন্দর।

বৈকালে চারিটার সময় কলম্ববন্দর হইতে আমাদের জাহাজ ছাড়িল এবং সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বেই লঙ্কাদ্বীপের শেষ রেখা সুদূর আকাশ ও জলের মাঝে মিশাইয়া গেল। এখন হইতে ভারতবর্ষের সহিত সকল সম্পর্ক ছাড়া—চারিদিকে কেবল অনন্তনীল জলরাশি ও সুনীল আকাশ।

ভারতসমুদ্র দিয়া প্রায় ১১ দিন যাওয়ার পর তবে এডেনে পৌঁছাইতে পারা যায়। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে চারিদিকে আর কিছুই দেখিবার নাই। তবুও সেই ক্ষুদ্র জাহাজখানির ভিতরে শত সহস্র লোকের বাস বলিয়া আমোদ আহ্লাদের কোনই অভাব বোধ হয় না। কত দেশের কত রাজ্যের লোকের সহিত একত্র বসা, দাঁড়ান, খেলা ও কথা বার্ত্তা। কাজ কর্ম্ম না থাকাতে সবাই ব্যস্ত হইয়া আলাপ করে। নাচ, গান ও অন্যান্য খেলার মধ্যে জুয়াখেলা একটি প্রধান।

এইরূপে দিন রাত চলিয়া ১১ দিনের দিন জাহাজ এডেন বন্দরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। এত দিন সমুদ্র বেশ প্রশান্ত ছিল,—কেবল জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর অবধিই মোরসুম চলাতে সমুদ্র ক্ষুব্ধ থাকে। কিন্তু এডেন উপসাগরে ঢুকিবার সময় বিষম তরঙ্গ আরম্ভ হইল। সারা সমুদ্রের যত ঢেউ এই সঙ্কীর্ণ পথে ঢুকে বলিয়াই সকল উপসাগরে বা নদীর মোহানায় ঢেউ বেশী হইয়া থাকে। কিন্তু অল্পক্ষণ এইরূপে আলোড়িত হইয়াই আমরা এডেন বন্দরে পৌঁছিলাম।

দূর হইতে কাল কাল ও গাছপালাহীন যে সকল পাহাড় দেখা যাইতেছিল—সেইরূপ পাহাড়েরই শিরোদেশে এডেন বন্দর নির্ম্মিত। গাছ পালায় শোভিত লঙ্কাদ্বীপের সঙ্গে তুলনায় এস্থান কিরূপ ভীষণ বোধ

হইল, তাহা বলা যায় না। এ আরবের মরুভূমির নিকটস্থ প্রস্তরময় দেশ। বন্দরেও বেশী জাহাজ বা নৌকা নাই। বড়ই নির্জ্জন স্থান। ছোট ছোট বাংলাগুলি সব পাহাড়ের গায়ে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে রক্ষিত। তাহাতে অল্পসংখ্যক মাত্র লোক বাস করে। সে দেশের লোকেরা সব কাল কাফরীর মত দেখিতে, চুল কোঁকড়া ও ছোট ছোট পশমের মত ও ঠোঁট পুরু; কিন্তু মুখখানি নারিকেল ফলের মত সুগঠন। এ স্থান ভারতবর্ষেরই এলাকাভুক্ত, তাই তাহারা অনেকে হিন্দি বুঝে। বহুদিন পূর্ব্বে যেমন সিঙ্গাপুরে দেখিয়াছিলাম ও সম্প্রতি যেমন কলম্বোতে দেখিয়াছি—ছোট ছোট নগ্ন মূর্ত্তি কতকগুলি ছেলে ছোট ছোট নৌকায় করিয়া আসিয়া সমুদ্রে ডুব দিয়া প্রক্ষিপ্ত সিকি দুয়ানী কুড়াইতে লাগিল। ইহারা এমন করিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে যে সকল মুসলমান সওদাগরেরা এখানে আসিয়া ব্যবসায় করে, তাহারা এইখানে আসিয়া কিছুদিনের জন্য এই দেশেরই স্ত্রীলোকদের পত্নীরূপে রাখে। তাহাদেরই গর্ভজাত এই ছেলেরা। পরে যখন এই সকল বণিকেরা নিজ দেশে ফিরিয়া যায়—এই সকল পরিত্যক্ত ছেলেদের উপায়ান্তর না থাকায়—তাহারা এইরূপে ও বন্দরে অন্যান্য কার্য্য করিয়া নিজেদের ভরণপোষণ চালায়।

এ মরুভূমির দেশে কেনা বেচা করিবার বেশী কিছু দ্রব্য নাই। লোকেরা নৌকায় করিয়া সুন্দর সুন্দর অষ্ট্রীচ পক্ষীর পালক ও ডিম লইয়া বেচিতে আসিল। মেয়েরা এই পালকের বড়ই ভক্ত; তাঁহারা অসম্ভব দাম দিয়া পালকের পাখা ও পালক কিনিতে লাগিলেন। দূরে একখানি বড়, আরব দেশের পুরাকালে যেরূপ নৌকার ব্যবহার হইত, সেই নৌকা দেখিলাম। চীনদেশের "জাঙ্কের" মত তাহারও থাম ও গলুই উচু ও তাহা পালে চলে। এইরূপ জাহাজে চড়িয়াই বিখ্যাত আরব দস্যুরা লোহিত সমুদ্র ও নিকটবর্ত্তী স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সমুদ্রে

যাত্রা এত ভয়ানক করিয়া তুলিয়াছিল। সে দিনের তুলনায় এখন কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

সে দিন আমাদের রাণী "এলেকজেন্ড্রিয়ার" জন্ম দিন বলিয়াই সকল জাহাজে ও বাড়ীতে সেখানে লাল ধ্বজা উঠান ছিল। দূরের সর্ব্বোচ্চ পাহাড়েও সেই ধ্বজা। সেই খানেই মার্কণীর তারহীন টেলিগ্রাফের উচ্চতর স্তম্ভ স্থাপিত ও সেনা-নিবাসের ব্যারাক গুলি শোভা পাইতেছিল। জলের কাছে সমুদ্রের ধারে ধারে একটি রাস্তা পাথরে গাঁথা—তার উপর দিয়া কত উষ্ট্র ও অশ্বতর বিষম কষ্টের সহিত বোঝা লইয়া পাহাড়ে চলিতেছে। এ মরুভূমি ও পাথরের দেশ এমন বৃষ্টিহীন যে, সারা বছরে ৮ ইঞ্চি মাত্র বৃষ্টি পড়ে। সেই বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিয়া জলকষ্ট নিবারণ করিবার জন্য এই নদীহীন দেশে পাহাড়ের জল নিকাশের পথে বাঁধ দিয়া সেই জল আটকাইয়া রাখা হয়। সে স্থানটীও দেখা যাইতে লাগিল। অনেক দিন হইতে জলরক্ষা করিবার এইরূপ প্রথা এডেন ও আরবের অন্যান্য দেশে খৃষ্ট পূর্ব্ব বহু শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিতেছে—প্রসিদ্ধ "আরবের বাঁধ" ইহার একটি। বহুদূরে একটি আরব পল্লী দেখা যায়, তাহাতেও নূতন নূতন সমৃদ্ধিশালী কোটা বাড়ী দেখা গেল, সুসভ্য লোকের সংস্পর্শে আসিয়া আরবও সভ্য হইয়াছে। আর একদিকে সমুদ্রের ধারে পরিষ্কার নুন প্রস্তুত করিবার জন্য একটা আড্ডা হইয়াছে। সেখানেও বড় বড় বাংলা ও বহুদূরব্যাপী সাদা সাদা নুন জমা করা রহিয়াছে দেখা গেল। এ কাজে খুব লাভ। যে দরে পূর্ব্বে ময়লা নুন বিক্রয় হইত, এখন তাহার সিকি দরে ভাল সাফ নুন বিক্রয় হইতেছে বলিয়া আরবদেশের ভিতরকার স্থানে অধিক এই নুনই চালান হয়। এমন কি সাইবিরিয়ায়ও অনেক অংশে এই নুন যায়। কিন্তু আজ কাল এত লাভ দেখিয়া—আরবের বন্দরের নিকটও এইরূপ অনেক নুনের আড়ৎ তৈয়ার হইয়াছে। নুন যত আবশ্যকীয় জিনিস হোক না হোক মুখরোচক জিনিস বলে সকল মানুষেই

চায় ও সেই কারণেই এর এত দাম ও লভ্যাংশ উভয়ই বেশী। বৃষ্টির যে জল বাঁধ দিয়া ধরিয়া রাখিবার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সে জল পান করিবার উপযুক্ত নহে। সমুদ্রের জল জ্বালাইয়া সাফ করিয়া ও পুনরায় জমাইয়া যে জল হয়, সেই জলই এখানে লোকে পান করে। এরূপ জ্বালান জল স্বাস্থ্যকর নহে বলিয়া জার্ম্মাণ সৈন্যদিগকে পূর্ব্বেকার মত আর এরূপ জল পান করিতে দেওয়া হয় না।

দেশ বড়ই শুকনা ও গরম, কিন্তু তাহাতে অস্বাস্থ্যকর নহে। তবে ওরূপ দারুণ উত্তাপে অনেক দিন থাকিলে শরীর বড়ই খারাপ হয় ও স্নায়ুদৌর্ব্বল্য ঘটে। এইখানে বাস করিবার কালে বিস্তর সৈন্য আত্মহত্যা করে। বোধ হয়, অতিরিক্ত গরমে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য বা মস্তিষ্কের বিকারই তাহার কারণ। প্লেগও এখানে আসিয়াছে, তবে টিকা দিয়া তাহার অনেক প্রতিকার বিধান হইয়াছে। ১৫০ জন, যাহারা টিকা লয়েন নাই, তাহাদের ভিতর ৩০টি মরেন। অপর ১৫০ জন যাহারা টিকা লইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেবল একটি আক্রান্ত হন ও মরেন।

এ প্লেগ অবশ্য ভারতবর্ষ হইতেই আসিয়াছে। প্রতি বৎসর হাজে বা মক্কায় ভারতবর্ষ হইতে বিস্তর মুসলমান যাত্রী যায়। তাহারাই এ রোগ এখানে আনিয়াছে। এই পথই তাহাদের যাইবার পথ। বহু পূর্ব্বেও এই সকল স্থানের সহিত বাণিজ্যসূত্রে ভারতবর্ষের লোকের অনেক গতিবিধি ছিল। এখনও রামায়ণ কথিত "রাম হাইদারের" কথা এখানে কথিত আছে।

এই বন্দরেরই অনতিদূরে "প্যারিম" দ্বীপ ইংরেজ অধিকৃত। ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ যাইবার পথে যতগুলি ইংরাজের অধিকৃত বন্দর আছে, এডেন তাহার মধ্যে একটি। জলের তলায় "টর্পেডো মাইন" বা তোপদাগী আছে, শত্রুর জাহাজ আসিলেই ফাটিয়া উঠিয়া সে তোপ জাহাজকে চূর্ণ করিবে। "প্যারিম দ্বীপ" ইংরেজের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার সম্বন্ধে ত্রৈলোক্যনাথ

মুখুজ্জে মহাশয়ের "বিলাত ভ্রমণ" নামক পুস্তকে একটি সুন্দর গল্প কথিত আছে। লোহিত সমুদ্রে ঢুকিবার পথেই এ দ্বীপটি অবস্থিত বলিয়াই ইহার জন্য নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধের সময় ইংরাজের এত আয়াস হইয়াছিল। একটি ফরাসী রণতরী এইটি অধিকার করিতে আসে ও তাহার অধ্যক্ষ ইংরেজ অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া কথায় কথায় এই সংবাদ জানাইয়া ফেলেন। সেই কথা জানিবামাত্র ইংরেজ সেনাপতি গুপ্তভাবে সেনা পাঠাইয়া আগে ধ্বজা গাড়িয়া সেইস্থান অধিকার করেন। অস্ত্র লইয়া যুদ্ধেই হউক বা বাক্ যুদ্ধেই হউক বুদ্ধিই চিরকাল জয়ী হয়।

এই ছোট "প্যারিম্" দ্বীপটির সম্বন্ধে আর একটি বলিবার মত কথা আছে। এইখানে দাস ব্যবসায় নিবারণের জন্য বিলাতের (Humanitarian Society) পরোপকার সমিতির কতকগুলি জাহাজ থাকে। তাহারা চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া খুঁজিয়া বেড়ায়, কেহ কোথাও জাহাজে করিয়া দাস বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইতেছে কিনা। সুদান জেঞ্জিবার প্রভৃতি স্থানে দাস ধরিয়া দাস ব্যবসায়ীরা এই পথ দিয়াই পারস্য উপসাগরের ভিতর Persian Gulf) ঢুকিয়া চারিদিকের দেশে দাস বিক্রয় করে। এই সকল মুসলমান দেশে সকল লোকেই দাস কেনে। তাই এই ব্যবসায়ে এত লাভ। যুবা এক একটি দাসের দাম ২৫ পাউণ্ড। এক একটি ছেলে তার অর্দ্ধেক দামে পাওয়া যায়। এক যুবতী স্ত্রীলোকের দাম আঠারো পাউণ্ড এবং সে পুত্রসম্ভবা হইলে ২০ পাউণ্ড লাগে। স্পেন পর্টুগাল ও অন্যান্য ইউরোপের লোক ও ইংরেজের পূর্ব্বপুরুষগণ,যথা "ড্রেক" "হকিন্স্" "হাডসন" এমন কি পণ্ডিত "রেলে" অবধি পূর্ব্বে আমেরিকার উপনিবেশে এই ব্যবসায় করিতেন। এখন এ প্রথা ইংরেজ রাজত্বের কোথাও নাই। আমেরিকার স্বাধীন রাজ্যের দক্ষিণ দিকে বেশী চাষ বাসেরই স্থান, সেই কারণ সেই সকল দেশে দাস ক্রয় বিক্রয় প্রথা [illegible] প্রচলিত ছিল। সেই প্রথা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াই আমে

রিকার যুক্তরাজ্যে ঘরাও বিবাদ উপস্থিত হয়। "Uncle Tom's Cabin" "খুড়া টম" নামক বিখ্যাত পুস্তকে দাসদের প্রতি নৃশংস অত্যাচারের কথা লেখাতেই দেশের সৎ লোকেরা এই প্রথা উঠাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর হন। এক সপ্তাহের ভিতর পঁচাত্তর হাজার পুস্তক বিক্রয় হয় ও দক্ষিণে ধনকুবের আপত্তিকারীদের সহিত যুদ্ধ বাধে। যুক্তরাজ্যে তৎকালীন সভাপতি "এব্রাহাম্ লিনকন্" প্রাণপণ করিয়া এ দুষ্ট প্রথা রদ করেন। ইনি একজন অতি গরিবের ছেলে ছিলেন। কুড়ে ঘর হইতে শেষে রাজপ্রাসাদে উঠিয়াছিলেন। দুর্ব্বলের দুঃখমোচন করাই তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। সুলেখক "থেয়ারের" লিখিত জীবনীতে এই প্রাতঃস্মরণীয় লোকের পবিত্র জীবন কাহিনী সবিশেষ বর্ণিত আছে। সকল লোকেরই স্বনামধন্য সেই মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত পড়া উচিত, বিশেষতঃ যে স্থানে গুপ্ত-হন্তারকের গুলি নিক্ষেপে তাঁহার পবিত্র জীবন, মুক্ত দাসদের অশ্রুকণা উপহার লইয়া এ লীলাভূমি ছাড়িয়া গেল। অতি দরিদ্র অবস্থায় এক জঙ্গলস্থ কুঁড়েঘরে জন্মাইয়া পরে নিজের চেষ্টায় যুক্তরাজ্যের রাজ-প্রাসাদে অবধি উঠিয়া জনসাধারণ ও নিগ্রোজাতির কি যে অশেষ মঙ্গল করিয়া গিয়াছেন সে পুণ্যকর্ম্ম সকলেরই জানা উচিত।

"এডেন" এই কথাটির মানে স্বর্গ। যদিও আমরা স্বর্গের কিছুই দেখিলাম না; তবুও অন্যান্য নিকটবর্ত্তী মরুভূমিময় স্থানের তুলনায় এই স্থানটি ভাল। ১৫০০ ফিট উচু এক আগ্নেয়গিরির উপরে অবস্থিত। ব্যবসায় বাণিজ্যসম্বন্ধে পূর্ব্বকালে কতই সমৃদ্ধিশালী ছিল। পরে সুয়েজ খালের পথ হওয়ার পর হইতে আরও বড় ব্যবসায়ের স্থান হইয়াছে। এখন এখানে ৩০ হাজার লোকের বাস ও স্থানটি সুদৃঢ়রূপে রক্ষিত। প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে এক আরবদেশীয় সুলতান ইংরাজকে ইহা দান করেন।

পূর্ব্বে এই পথ দিয়াই মক্কা যাইবার যাত্রীদের কতই না কষ্ট ছিল।

জাহাজে অনেক লোক লওয়াতে যাত্রীদের যন্ত্রণার একশেষ ছিল ও একত্র বাসের ফলে অনেক সংক্রামক রোগও ঘটিত। তুর্কীর এলাকায় থাকিতে সেখানকার কর্ম্মচারীরা অশেষরূপে পয়সা আদায় করিয়া লইত। অনেকে অর্থাভাবে আর দেশে ফিরিতে পাইত না। এখন এ সবের সুব্যবস্থা হইয়াছে। সেখানে একজন তত্ত্বাবধান করিবার জন্য ইংরেজ তরফ হইতে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছে। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্য ঔষধালয় ও কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে।

লোহিত সমুদ্র ও সুয়েজ বন্দর।

এডেন বন্দর ছাড়িয়া কিছু দূরে যাইলেই লোহিত সমুদ্রে পড়া যায়। সে স্থানটির কেন যে লোহিত সমুদ্র নাম হইল, তার কিছুই বুঝা যায় না। অন্য স্থানেরই মত সমুদ্র-জল নীল, তবে দুধারেই জমী নিকটে থাকায় একটু সবুজ মিশ্রিত নীল। মাঝে মাঝে ঈষৎ লাল এক রকম শেওলা জলে ভাসে, তাও বেশী নয়। এ ছাড়া আর কোনও কারণ দেখিলাম না।

এই শেওলাগুলিতে একটি অতি বিস্ময়জনক ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তা অনেকেই জানেন না। অনেকগুলি লম্বা লম্বা দড়ির মত শেওলা একত্র মিলিয়াই ওই চাপ শেওলা হইয়াছে। প্রতি দড়িটি অনেকগুলি কোষ পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট হইয়াই গঠিত। ওই এক একটি কোষ সজীব পদার্থ। তার প্রতিটির ভিতর কি একটি সজীব পদার্থ নড়িতে দেখা যায়। কোষের ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া তাহারা নিজেদের খাদ্যসামগ্রী ধরিয়া খায়। এবং অপর একটি কোষের সহিত মিলিত হইয়া সেই কোষটির গর্ভাধান ঘটায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই সকল বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন স্বচক্ষে দেখা যায়। প্রতি কোষ একা থাকিয়াও ভাগ হইতে পারে সত্য, কিন্তু (cell division) দুইটিতে মিলিত হইয়া যে নূতন কোষ হয়—সে আরও সুস্থ ও সতেজ হয়। তাই প্রকৃতির সর্ব্বত্রই এইরূপই নিয়ম।

চারিদিকে জমী থাকায় এ স্থানে সমুদ্র অন্যান্য সমুদ্র হইতে অনেক ধীর, যেন বড় পুকুরের মত। তাই জাহাজও বেশী দোলে না। আর আফ্রিকা ও আরব—উভয় দিকেই দারুণ উত্তপ্ত বালুময় মরুভূমি থাকায় স্থানটি বড়ই গরম। এই কারণে গরম কালে এখানে অনেক লোকের সর্দ্দিগর্ম্মী হয়। এই লোহিত সমুদ্রে তিন চারি দিন থাকিতে হয়।

জাহাজ যাইবার পক্ষে এ সমুদ্রটিও বড় ভয়ানক। জলে নিমজ্জিত পাহাড় আছে—তাহাতে জাহাজ লাগিলে সে জাহাজের আর রক্ষা নাই। তাই ঐ সকল বিপদ সঙ্কুল স্থানে আলোক স্তম্ভ নির্ম্মিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন গতিতে নানা রঙের আলো ঘুরিয়া বিশেষ বিশেষ স্থান জানাইয়া দেয়। তার মধ্যে এক স্থানে কতকগুলি একত্র অবস্থিত পাহাড়ের নাম "সাত শিষ্য" (Seven apostle) আর এক স্থানের একটি অর্দ্ধ নিমজ্জিত পাহাড়ের নাম (Diadalus) "ডায়েডেলস্", সবগুলিই ভয়ানক স্থান।

লোহিত সমুদ্র বেশী চওড়াও নয়। অনেক স্থলেই একদিককার বা অপর দিকের জমী ও পাহাড় দেখা যায়। অনেক স্থলে দুদিকেরই জমী দৃষ্টিগোচর হয়। ইহুদীরা যখন মিশর দেশ হইতে পলাইয়া আসিতেছিলেন, এই সকল অপ্রশস্ত স্থানের কোনও স্থান দিয়াই বোধ হয় তাঁহাদের যাইবার জন্য জলের মধ্য হইতে শুকনা পথ বাহির হইয়াছিল।

এই অল্প আয়তন স্থান দিয়া, এসিয়া হইতে ইউরোপ যাইবার অধিকাংশ জাহাজকেই যাইতে হয় বলিয়া এখানে অনেক জাহাজের সহিত দেখা হয়। সবাই তখন সকল কাজ ফেলিয়া এক দৃষ্টে পরস্পরকে দেখে—ও আনন্দের ধ্বনি তুলিয়া পরস্পরের শুভবার্ত্তা জানায়। পথে জাহাজ দেখিলেই তার নাম ধাম ও পথের খবর লইয়া পরবর্ত্তী বন্দরে গিয়া খবর দিতে সকল জাহাজই বাধ্য। এই নিয়ম থাকাতেই অকূল সমুদ্রে জাহাজের খবরাখবর হয়।

পুরাতন ভূগোল লেখক পণ্ডিত টলেমী আরব দেশকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যথা—"মরুময় আরব", "প্রস্তরময় আরব," ও "সুখের আরব"। চারিদিকের সমুদ্র ধারের জমীগুলি কতক বা উর্ব্বরাক্ষেত্র কতক বা প্রস্তরময় কিন্তু ভিতরকার সব অংশ মরুভূমি। এখানে অতি সামান্য বৃষ্টি পড়ে বলিয়া এই সমস্ত দেশে একটিও বড়

পুরাতন ইতিহাসে এই সকল স্থান প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। বাম ধারে "অবিসিনিয়া," "নিউবিয়া" ও "মিশর।" যত দেশের পুরাতত্ত্ব জানা আছে, তার মধ্যে মিশর দেশই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। খৃষ্টপূর্ব্ব পাঁচ হাজার বৎসরের আগেও তাহাদের সভ্যতার খবর পাওয়া যায়। এই খানেই রাণী "ক্লিওপেট্রা"র রাজ্য ছিল। এইখানেই এখনও সেই সকল পুরাতন পিরামিড্ বর্ত্তমান আছে। আর ডান দিকে আরবদেশে মুসলমানধর্ম্মের সংস্থাপক মহম্মদের জন্ম। মক্কা ও মেদীনাই তাঁহার লীলাভূমি ছিল। সে সকল দেশ লোহিত সমুদ্রের খুব ধারে ধারে। সুয়েজে ঢুকিবার পথেই ডান দিকে "সাইনে পর্ব্বত"। এই পুণ্য ভূমিতেই "মোসেস্" প্রথমে ঈশ্বর কথিত দশটি আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

খৃষ্টধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান "পেলেষ্টাইন" এখান হইতে কতক দূরে। মরুময় আরব দেশেই কেন যে এই দুইটি ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল, বুঝা যায় না। যেখানে গাছ পালা ফুল ফল ও জীবনের অন্যান্য ভোগ্যবস্তু কম, সেইখানেই কি ইহসংসারের উপর বিরাগ আপনিই আসে। তাহলে শস্য-শ্যামলা ভারতবর্ষেই বা কেন হিন্দুধর্ম্ম ও বুদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব হলো। সমস্ত পৃথিবীই হয় আরবদেশের নয় ভারতবর্ষের ধর্ম্মেই দীক্ষিত। অন্য কোথাওতো এমন ধর্ম্ম প্রচারকগণ জন্মেন নাই।

সুয়েজের কাছে যাইয়াই আবার সমুদ্র বিষম তরঙ্গময় হইয়া উঠিল। অতি তেজে হাওয়া বহিতে লাগিল। জাহাজ অত্যন্ত অস্থির হইল। সুতরাং সেদিন বৈকালে বন্দরে নোঙ্গর করিলেও কেহ তীরে নামিতে পারিলেন না, বা তীর হইতেও কেহ জাহাজে আসিতে পারিলেন না। কেবল আমরা জাহাজের উচু ডেকে দাঁড়াইয়া দুই ধারের বালুকাময় ও কাল কাল পাহাড়যুক্ত জমীর, ও বড় বড় তরঙ্গপূর্ণ সমুদ্রজলের, ও দুরন্ত সুয়েজ বন্দরের অপূর্ব্ব ভীষণ শোভা দেখিতে লাগিলাম।

সুয়েজ বন্দরটি অতি ছোট বন্দর। যে স্থানে সে দেশীয় লোকের

বাস, সে স্থান এখান হইতে অনেক দূরে। গাধায় চড়িয়া যাইতে হয়, অন্য কোনও যান পাওয়া যায় না। বন্দরে সব পাথরের উচু উচু বাড়ীগুলি সমুদ্রের ধারে ধারে নির্ম্মিত; তাহার অধিকাংশই সওদাগরদের মাল রাখিবার গুদাম—বড় একটা লোকবাসের নহে। অনেক কল কারখানাও আছে। স্থানটি দুটি অংশে বিভক্ত। সুয়েজের খাল এই দুটির মধ্য দিয়া কাটা। তার উপর দিয়া এক চওড়া পাথরের প্রাচীর গাথা—ইহারই উপর সুয়েজের রেল চলে। এইখানেই বিলাতী মেল জাহাজ হইতে এই রেলে দেওয়া হয়—ও সেই রেলযোগে সুয়েজখালের ধার দিয়া সে ডাক এলেকজান্দ্রায় পৌছায়, সেখান হইতে আবার জাহাজে করিয়া বৃন্দিসি বন্দরে যায়, আবার রেলযোগে ও ষ্টীমারে ইটালী ফ্রান্স ও ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া বিলাতে পৌছায়। সে সাত সমুদ্র তের নদীর পথ। এত দূর হইতেও ইংরেজ আসিয়া,—ত্রিশ কোটী লোককে শাসন করেন। এর কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, তাঁহাদের বুদ্ধির বল, সুব্যবস্থা, ও সতত উন্নতির চেষ্টা। আর আমাদের নিশ্চেষ্ট হয়ে নানারূপ সূক্ষ্ম বিচার ও পরচর্চ্চায় মূল্যবান্ সময় কাটান।

জাহাজ নোঙ্গর করিলে অনেক মিশরবাসী নানারূপ দেশী ও বিদেশী দ্রব্যাদি লইয়া জাহাজে বেচিতে আসিল। তারা আমাদের দেশের লোকের অপেক্ষা অনেক ঢেঙা, অনেক বলিষ্ঠ ও ফরসা রং বিশিষ্ট। তাহারা চলচলে ইজেরের উপরে পা অবধি লম্বা একটি আলখেল্লা পরে। তাতে বেশ সুসভ্য ও সুশ্রী দেখায়। মাথায় একটি রঙ্গিন কাপড়ের পাগড়ী। আরব দেশের লোকেরা এইরূপই পোষাক করে। আমাদের অপেক্ষাও গরম দেশ, কিন্তু তবুও লম্বা সুসভ্য পোষাক পরা তাহাদের দেশের বিধি। আমাদের বাঙ্গালা দেশের কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই নিত্যকার পোষাক সম্বন্ধে অনেক কথা শিখিতে আছে। তাহারা অতিশয়

লাগিল। তাহাদের মুখের ভাব কিন্তু একটুও মধুর নহে। যেন তাতে কুবাসনা ও দস্যুবৃত্তি সর্ব্বদাই জাগিয়া আছে। আরব দস্যুর কথা তো সকলেই জানেন, তাহারা বড়ই ভয়ানক ; উটে চড়িয়া পথে পথে ধনলুণ্ঠন, দল সংগ্রহ ও নরহত্যা করে। মিশরের রাণী ক্লিউপেট্রার চরিত্র হইতেই যেমন দেখা যায়—তাদের হাব ভাব এই হিসাবে বড়ই হীন।

আরব ও মিশরে জিনিষ পত্র ইউরোপবাসীরা প্রবাস হইতে বাড়ী ফিরিবার কালে বড়ই আদর করিয়া কেনে। আসিয়া আফ্রিকা এই সকল দেশই ইউরোপের খুব নিকটবর্ত্তী। মিশরেই কিন্তু কথায় কথায় তাঁহারা শীতকালে পরিবর্ত্তনে আসেন। যত কিছু পুরাতত্ত্ব মিশর লইয়াই গঠিত। অন্যান্য সকল পুরাতন দেশের সঙ্গে তুলনায় তারাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন জাতি বলিয়া সাব্যস্থ হইয়াছে। সেই খানেই অতি বিস্ময়কর পিরামিড আছে ও অন্যান্য নানা প্রকার প্রত্নতত্ত্বের স্থান। সেই কারণেই মিশর ও মিশরদেশীয় যা কিছুর এত আদর। বাড়ী ফিরিবার কালে সবাই বৈঠকখানা সাজাইবার ও বন্ধু বান্ধবদের উপহার দিবার জন্য এখানকার জিনিষপত্র কিনেন। আমিও কিছু কিছু কিনিয়াছি ; যখনই সেগুলি দেখি সেই স্থানের ও সেই দেশের কথা অহরহ মনে পড়ে। এই সকল দ্রব্যের কতকগুলির সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

বলা বাহুল্য মিশর একটি বিখ্যাত তামাকপাতা ও সিগারেটের দেশ। সেই সকল বহু পরিমাণে এখান হইতে রপ্তানি হয়। ছোট ছোট বাক্স করিয়া সেই সকল সিগারেটও জাহাজে বেচিতে আনে। সে কৌটাগুলির অনেকগুলির সামনে নগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তি আঁকা। ছেলে বুড়া সবাই বাছিয়া বাছিয়া সেই কৌটাগুলিই কিনে।

আর একটি কিনিবার জিনিষ—কাঁচ ও পলাকাটি নির্ম্মিত গলার হার। সেগুলিতে বহু রকমের রং বিন্যস্ত আছে। গলায় পর বা হাতে জড়িয়ে

সেই দিকে আকর্ষণ—সেই দিকেই সর্ব্বাপেক্ষা জনতা। অনেকে অসম্ভব দাম দিয়া লইলেন। আর যে সকল পুরুষের ঘরেও হার পরাবার লোক আছেন, তাহারাও অনেকগুলি কিনিলেন্। প্রথম এক জনা যে দামে নেন শেষে সে দাম কমিয়া কমিয়া সিকি হইল।

সুন্দর সুন্দর কার্পেটও পাওয়া যায়। তাতে নানারূপ ভাল ভাল মিশর দেশ ও সমাজের ছবি লেখা। তার অধিকাংশেই সোফায় বসিয়া গৃহস্বামী ধুম পান বা চা পান করছেন,আর সামনে নর্ত্তকী নৃত্য করিতেছে। আবার কতকগুলিতে উটের গোল হাওদায় চড়িয়া কোমলদেহা-পরদানসীন রমণীরা স্থানান্তরে যাইতেছেন—আর তাঁহাদের স্বামী নিজে উট চালাইয়া পদব্রজে যাইতেছেন। মিশর দেশের প্রায় সকল চিত্রপটেই স্ত্রীলোক, উট ও তাল গাছের চিত্র থাকে।

ছবি আঁকা পোষ্টকার্ড বিক্রয় এখানে একটি প্রসিদ্ধ লাভের ব্যবসা। এখানকার প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে যত জিনিষ আছে সবেরই সুন্দর সুন্দর ছবি বিক্রয় হয়। মরুভূমিতে পিরামিড্, ফিন্কস্, ও ভাঙ্গা দেবমন্দির ও অট্টালিকার নানারূপ মূর্ত্তি খোদিত দেওয়ালের ছবি আঁকা। আমি তার অনেক ছবি সঙ্গে আনিয়াছি; বারান্তরে বলিব।

আর একটি কিনিবার জিনিষ—সে দেশের দস্তার পদক। সেগুলিতে নানারূপ জীবজন্তুর মাথা বিশিষ্ট নরমূর্ত্তি বিভিন্ন ভাবে খোদিত আছে। সেগুলি সব সেই দেশেরই দেবতা।

শেষ যেটি কিনিলাম, পূর্ব্বে কিনিয়াও আবার কিনিলাম—সে কতকগুলি ছোট ছোট ফুলের খাতা। প্যালেষ্টাইনের ফুল বলিয়া অনেক খৃষ্টানেরা আগ্রহের সহিত কিনেন। একজন ভারতবর্ষেরই পাদরী মেম বিস্তর কিনিয়া নানা লোককে উপহার পাঠাইলেন, আমিও অনেকগুলি কিনিলাম। ছোট ফুলের এমন সৌন্দর্য্য কোথাও দেখি নাই। খাতাখানি এত ছোট যে বুকের পকেটে রাখা চলে। আর খুলিয়া দেখিলেই যেটী

পাতে আলো করা পুণ্যভূমির সেই ফুলগুলি দেখা যায়। পাতলা পাতা দিয়া চাপা। কি দিয়া যে ফুলের মত এত সুন্দর এত নশ্বর জিনিষকে এমন করিয়া ঠিক রাখিয়াছে, তাহা জানি না। মনুষ্য দেহ তো এমন করিয়া রাখা যায় না। কিন্তু এ ফুলগুলি এমন সুরক্ষিত যে, এক বৎসর পরে এখনও খুলিলে যেন সদ্য তাজা মনে হয়—ও ফুলপ্রিয় একজনের মধুর স্মৃতি মনে জাগাইয়া প্রাণ আনন্দে মাতাইয়া তুলে।

৫

সুয়েজের খাল।

সন্ধ্যার সময় আমরা সুয়েজখালে ঢুকিলাম। তখন অন্ধকার হইয়াছে —তাই কেবল ক্ষীণ দীপালোকে আলোকিত চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেলমাত্র ; ভাল করিয়া তেমন বুঝা গেল না।

জাহাজ দিনরাতই চলে, তবে সুয়েজখালে অতি আস্তে আস্তে গিয়া থাকে, তার কারণ অপ্রশস্ত খালের দুই ধারই বালুময়। জোরে জাহাজ চালাইলে জলের বেশী আন্দোলনে দুই ধারের বালু পাছে ঝরিয়া যায়, এই আশঙ্কা। খালটি স্থানে স্থানে অতি অপ্রশস্ত ও অনতিগভীর। অনেক স্থানে এমন কি দুটি জাহাজ পাশাপাশি যাইতে পারে না। বড় জাহাজ বা চওড়া জাহাজ যে অনেক জল ভাঙ্গে সে সব জাহাজও এখান দিয়া আসিতে পারে না। তাই রুষ-জাপান যুদ্ধে এডমিরাল রুডোভিনস্কির জাহাজ "কেপ্ অব্ গুড্‌হোপ্" ঘুরাইয়া আনিতে হইল। মাঝে মাঝে কতক বিস্তীর্ণ লোণা জলের হ্রদ আছে, খাল সেইগুলির সহিতই সংযুক্ত। একটি জাহাজ সেইখানে দাঁড়াইলে, অপরটি পাশ কাটাইয়া যায়। খালেও অপর এমন সকল স্থান আছে যেখানে পাশাপাশি যাইতে পারে। এখন অল্প অল্প করিয়া কাটিয়া খাল চওড়া করা হইতেছে।

খালটি ১০০ মাইল লম্বা, তবে জাহাজ অত আস্তে যায় বলিয়া পার হইতে প্রায় দুইদিন লাগে। অল্প গভীর ও অল্প প্রশস্ত এই খালে জাহাজ ঢুকিলেই জলগুলি উপচাইয়া ধারের বালুর উপর উঠিয়া ফেনাইতে ফেনাইতে বাণডাকার মত ছুটে ; তাতেই দেখা যায়— অনেক বালু ঝরিয়া পড়িতেছে, তাই এখন ধরে ধারে ইটের ছোট প্রাচীরে বাঁধান হইতেছে।

সেই দেশেরই লোক—কাল ষণ্ডা ও নীল আলখাল্লা পরা। উটের পিঠে করিয়া কাটা বালি বোঝাই করিয়া দূরে ফেলিতেছে।

এস্থানে এমন মরুভূমির স্থান যে, দুইধারে বালুময় মাঠ বই আর কিছুই দেখা যায় না। অনেক স্থানেই গাছপালার চিহ্নও নাই। এমন কি একটু শেওলা বা পানা বা ঘাসও দেখা যায় না। তবে আজকাল একরূপ অনেক শিকড়বিশিষ্ট লতান গাছ রোপণ করা হইতেছে। সে গাছগুলি পুরীর সমুদ্রধারের বালুময় স্থানগুলিতে বালু উড়া বন্ধ করিবার জন্য বিস্তর দেওয়া আছে—দেখা যায়। "কনভলভুলস্" শ্রেণীর গাছ। এক স্থান হইতে অল্পদিনেই চারিদিকে লতাইয়া জমিতে ঘন ঘন শিকড় চালায়—ও যত শুক্না জমি হউক না কেন তা হইতে রস শুষিয়া জীবন ধারণ করে। অতি অল্প দিনেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়াতে—ও অনেক স্থানে শিকড় আছে বলিয়া—এক স্থান মরিলেই অপর স্থান মরে না। আর প্রতি শিকড়গুলি অনেকগুলি বালুকে একত্র করিয়া রাখে, তাই বালিও ভাঙ্গে না। এইরূপ নানা সুবিধার জন্য এই গাছই এরূপ স্থানে এত উপকারী। যেমন ধান গম আমাদের খাদ্য জোগায় ও বাঁশ খড় শাল সেগুন আমাদের ঘর বাঁধিয়া দেয়, এবং কার্পাস শিমুল আমাদের বস্ত্র আনে, তেমনি এই সকল গাছও স্থান বিশেষে এত কাজে লাগে। সকল জিনিষেরই এমনি উপকারিতা আছে, বিজ্ঞানের সাহায্যে মানববুদ্ধি সেইগুলিকে অনুসন্ধান করিয়া নিজের কাজে লাগাইতেছে। যে এইরূপে প্রকৃতির বিভিন্ন দ্রব্য-গুলিকে ও শক্তি সমূহকে বুদ্ধিবলে আপন কাজে লাগাইতে পারে সেই জয়ী—সেই কৃতকার্য্য—সেই রাজা।

অমন স্থানে কিনারায় থাকিবার তো জায়গা নাই; তাই জলের উপরেই একরূপ দোতালা বাড়ীর মত বোট আছে, সেইখানে কর্ম্মচারীরা থাকে। তবে মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর ইষ্টিসনও দেখা যায়। জলের ধারেই নূতন বাংলা গাঁথা। সেগুলি অতি সুন্দর স্থান। ভীষণ স্থানের

পাশে থাকিয়া আরও সুন্দর হইয়াছে। সেখানে অনেক গাছ পালা দেখা যায়। ওদিককার প্রসিদ্ধ ঘন পাতাযুক্ত খেজুর গাছ তো আছেই তা ছাড়া বিস্তর ফুল গাছও দেখা যায়। কর্ম্মচারীরা অতি যত্ন করিয়া টবে করিয়া সেগুলিকে রক্ষা করে। অনেকগুলিতে ফুল ফুটা ছিল—দেখে চোখ জুড়াল। লোক অতি কম—তবে অনেকগুলি সে দেশীয় ছেলেদের খেলা করিতে দেখিলাম। অন্য দেশের ছেলের মত তারাও মরুভূমির মাঝে নেচে হেসে খেলা করচে। আবরু প্রথা সকল মুসলমান দেশেই এত প্রচলিত বলিয়া, এ সকল স্থানে স্ত্রীলোক বড় একটা দেখা যায় না, তাই এ সকল স্থান আরও ভীষণ মরুভূমি বলিয়া মনে হয়। তবে একটি স্থানে দুটি আরব রমণী দেখিলাম। তার মধ্যে একজন অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা, আর এক স্থানে একটি অতি সুন্দর দৃশ্য দেখিলাম—ফরসা ইউরোপীয় রং বিশিষ্ট ও আরবের মুখশ্রী লইয়া একটি শিশু তীরে দাঁড়াইয়া ছিল। দুটি জাতির মাধুর্য্যের একত্র সমাবেশ—কি সুন্দর হইয়াছে—এইরূপ সুন্দর দৃশ্য আমি চীনেও দেখিয়াছি। সমাজের কঠিন নিয়ম তুচ্ছ করিয়া এ মরুভূমেও মানবপ্রকৃতি আপনার আধিপত্য দেখাইয়াছে।

এই সকল দেশ একরূপ ভোজবাজীর দেশ, চারি পাশে মরুভূমির বালুর উপর সব ছায়া দেখা যায়। যেন জলেরই প্রতিবিম্ব। একেই মিরাজ বা "মরীচিকা" বলে। মরুভূমির তপ্ত বালুর উপরকার বালুস্তর বিভিন্ন রূপে উত্তপ্ত হইয়া এইরূপ ছবি দেখায়। ইহাই "মৃগতৃষ্ণা", এইরূপ প্রতিবিম্বকেই জল হইতে প্রতিবিম্ব মনে করিয়া শুষ্ককণ্ঠ মৃগ চারিদিকে জলপান আশায় ছুটে। প্রতি দিনকার মানব হৃদয়েরই অতৃপ্ত বাসনার সঙ্গে তার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

উটগুলি এই মরুভূমিরই জন্ত; এই মরুভূমিতে থাকিবার উপযুক্ত করিয়াই তারা সৃষ্ট হইয়াছে। তপ্ত বালুর উপর বেড়াইবার জন্য পায়ের তলাগুলি চেপ্টা ও নরম। সে স্থানের হাওয়া উত্তপ্ত বালুকণামিশ্রিত

বলিয়া—তাদের চোখ নাক ও কানের জন্য চামড়ার আবরণ আছে, টানিয়া দিয়া বন্ধ করা যায়। দাঁতগুলি মরুভূমির দগ্ধ শুক্‌না ও শক্ত ঘাস উপড়াইয়া খাইবার অনুরূপ। নীচে পাটীর সামনের চেপ্টা দাঁতের উপর—শক্ত মাড়ীর স্তর। পিটে উচু কুব্জের মত থাকে—সেগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষদ্বারা গঠিত। অনেক দিন মরুভূমে খাদ্য ও জলহীন হইয়া থাকিতে হয় বলিয়া এই সকলের ভিতর উট জল পান করিয়া ও আহার করিয়া জল ও খাদ্য রস ভরিয়া রাখে। এইগুলি হইতে সার রস শোষণ করিয়া বহুদিন ধরিয়া উপবাসী উট মরুভূমে বাঁচিয়া থাকে। বীজের ভিতর যেমন শস্য ভ্রূণের আহার্য্য থাকে এ সকল জীবও আহার সঙ্গে রাখিয়াই বাঁচিয়া থাকে।

বোঝাই লইবার কালে উট আপনিই বসে, ও বাঁশি বাজাইলে চলিয়া যায়। এ সকল দেশে উষ্ট্রই গৃহ পালিত পশু। আমাদের দেশের গরুর মত কত উপকারে লাগে। মোট বয়, দুধ দেয়, ও শরীরের মাংস দিয়া আরব দেশের লোককে খাওয়ায়। তার আর একটী আদরের নাম "Ship of the desert" অর্থাৎ মরুভূমির জাহাজ। দলে দলে সুশিক্ষিত এই সকল উট ইঙ্গিতে মানবের হিতকর এই সকল কার্য্য করিতেছে দেখিলে এক অপূর্ব্ব ভাব মনে আসে।

এ ছাড়া কতকগুলি মিউল বা অশ্বতরও দেখিলাম। সেগুলি গাধা ও ঘোড়ার দো-আসলা জাতি। খর্ব্বাকৃতি কিন্তু বড়ই কষ্টসহিষ্ণু। দো-আসলা জাতির এই গুণ চিরপ্রসিদ্ধ। তাহারা মরিয়াও মরে না—অতি হীন অবস্থায় জীবন রক্ষা করিতে পারে। যে দুইটী জাতি মিশ্রিত হইয়া তাহারা হইয়াছে সেই দুটি জাতিরই কষ্ট সহিবার ক্ষমতা লইয়া জন্মায়। তাই তারা এত কর্ম্মঠ। তাই প্রকারান্তরে পশুপালকেরা পশুর শক্তি ও ক্ষমতা জন্মাইবার জন্য এইরূপ নিয়মের সময়ে সময়ে সাহায্য লয়। অশ্বতরেও বিশেষ উপকারিতা এই কারণে এরূপ পশুর দোষ এই যে ইহারা [illegible] হয় না—অর্থাৎ ইহাদের বংশরক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই।

এ ছাড়া আরব দেশে সুন্দর সুন্দর ঘোড়া আছে—সে ঘোড়া পৃথিবীর সকল স্থানে আদরণীয়। তাহারই সঙ্গে দো-আসলা করিয়া পৃথিবীর অনেক শ্রেণীর ভাল ভাল ঘোড়া হইয়াছে। আরব ঘোড়া কত বুদ্ধিমান্ কত প্রভুভক্ত। তার অনেক দৃষ্টান্ত সকলেই জানেন। প্রভুর কাজে তারা মরিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

এই জায়গায় এক স্থানে একটি আরবদেশের ফকিরকে দেখিয়াছিলাম। তাদের "সুফী" বলে। তারা অনেকটা আমাদের দেশের সাধুদেরই মত। বেদান্তের মত মত ও থিষ্টিকদের মত ধর্ম্ম বিশ্বাস। আসন-পিঁড়িতে বসিয়া ধ্যান করে। তাদের কথা বারান্তরে বলিব।

গেল বারের আরব দস্যুর ছবিতে যে দস্যুদের প্রতিমূর্ত্তি দেখান হইয়াছে তারা সব "বুডিন" জাতীয় আরব। দস্যুবৃত্তিই তাদের অধিকাংশ লোকের পেশা। ইহারা আরবের সেনা স্থানে থাকিয়া কঠিন পরিশ্রম করে বলিয়া ইহাদের শরীর বড়ই পটু ও মাংসপেশী শক্ত ও দৃঢ়। মুসলমান ধর্ম্মের সংস্থাপক মহম্মদ এই জাতীয় ধাত্রীর হাতেই লালিত পালিত হন। তাঁহার মাতা ছেলেকে সবল ও সুস্থ করিবার জন্য তখনকার প্রথা অনুসারে বুডিন জাতীয়া এক ধাত্রীর হাতে তাহার লালন পালন ভার দিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর পরে যখন ধাত্রী ছেলেকে ফিরাইয়া দিতে আসিল মা ছোট ছেলের দৃঢ় গঠন দেখিয়া তাহাকে আরও দৃঢ় করিবার মানসে ধাত্রীকে ছেলে ফিরাইয়া পূর্ব্বস্থানে লইয়া যাইতে বলিলেন। এমন মা ও এমন ধাত্রী ছিল বলিয়াই মহম্মদ এমন কর্ম্মবীর হইয়াছিলেন। এই বুডিন জাতীয় আরবেরা অতি সুপুরুষ ও বন্দরে ও এই সকল স্থানে অনেক দেখা যায়।

এই খালের এক প্রান্তে যেমন সুয়েজ—তেমনি অপর প্রান্তে "সৈয়েদ্" বন্দর বর্ত্তমান; আর এ দুইয়ের মাঝে অর্থাৎ কেনালের অর্দ্ধ পথে ইসলামিয়া সহর অবস্থিত। এ স্থানটি ছোট ও দেখিতে যেন ছবির মত,

একটি লোনা হ্রদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে এমন কদর্য্য স্থান আর ছিল না। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কীটাণুজ রোগের এত প্রাদুর্ভাব ছিল যে ইউরোপবাসী যে এখানে আসিত সেই মরিত। অথচ স্থানটি ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে বড়ই সুবিধাজনক। কোনওরূপে দাঁড় করান চাই। এইরূপ স্বার্থের চেষ্টায় প্রণোদিত হইয়া কতরূপ পরীক্ষাই চলিতে লাগিল। এই সময়েই "রসের" (Mosquito malaria theory) মশাও ম্যালেরিয়া রোগের সহিত যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে সেই আবিষ্কার প্রচার হয়। মশা কামড়েই এক রোগী হইতে অপর রোগীতে ম্যালেরিয়া রোগ যায়। অতএব মশা হনন করিলেই সে রোগ থামিবে। এখন মশা মারা তো সোজা নয়! কি করে মশাকে নির্ব্বংশ করা যায়, এই অনুসন্ধান করিতে করিতে জানা গেল যে মশার বীজ প্রথমে জলে থাকে তাই জল জমা বন্ধ করিয়া ও জলের উপর কেরাসীন্ তেল ঢালিয়া আগুন দিয়া মশার বীজ মারাতে এখন ম্যালেরিয়া এখানে অনেক কমিয়াছে। এমন মারীভয় ছিল বলিয়া সেখানে কেহ যাইতে চাহিত না। জমির দাম ছিল না। কতক স্বাস্থ্যকর হওয়াতে এখন তাহার কত দাম বাড়িয়াছে।

বুদ্ধি বলে মানুষ কিনা করিতে পারে ? সেই বুদ্ধির সাহায্যে ক্ষুদ্র মানব প্রকৃতির বিশাল রাজ্যে দিন দিন কিরূপ ক্ষমতা বিস্তার করিতেছে। সাগর বাঁধিয়াছে, পাহাড় কাটিয়া সুরঙ্গ করিয়া পথ করিয়াছে, জলস্রোত হাওয়া তার ভৃত্যের মত কাজ করে, আর স্বয়ং অগ্নি কল্ চালাইয়া তাকে সাহায্য করে ; এমন ব্রহ্মাণ্ডপ্রসারী মহতী মানববুদ্ধিকে আমি শতবার নমস্কার করি।

সৈয়দ বন্দর।

দুই দিন ক্রমাগত যাওয়ার পর তৃতীয় দিন সন্ধ্যাবেলা সৈয়দবন্দর দেখা গেল। আরবের মরুভূমির একপ্রান্তে ভূমধ্যস্থসাগর ও সুয়েজ খালের সঙ্গম স্থলে সেই ছোট নূতন বন্দরটি অবস্থিত। খোলা স্থান ও মরুভূমির দেশ কিনা, তাই বহুদূর হইতে দূরের জিনিষ দেখা যায়। বন্দরের নূতন উঁচু উঁচু বাড়ীগুলি ও সব কল কারখানা, আকাশে চূড়া তুলিয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। বন্দরে অসংখ্য নানাজাতীয় জাহাজের ভিড়। উচ্চ আলোকস্তম্ভ হইতে একটি প্রখর আলো চারিদিক জুড়িয়া সব জাহাজ-গুলিকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

প্রবেশ করিয়াই বড় বড় থাম ও গম্বুজযুক্ত কষ্টম হাউসের বাড়ীটি প্রথমেই দেখা গেল। ইউরোপ ও এসিয়ার মধ্যে এই স্থানটিই এখন সঙ্গম স্থল হইয়াছে বলিয়া এখানে সকল বিষয়েই কড়াকড়ি। তার উপর আবার এস্থলে নানাজাতীয় লোকের একত্র বাস ও ক্ষমতা বিস্তর। ফরাসী জাতিরাই প্রথমে সুয়েজ খাল কাটেন ও এই বন্দরটি নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু এটি তুর্কীর সুলতানের এলাকাভুক্ত। আবার উভয়ের ক্ষমতাকে অতিক্রম করিয়া ইংরেজই এখানে প্রবল। অনেক গ্রীক ও ইতালী দেশের লোক এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করে। তবে মিশর দেশের অধিবাসীরাই অধিকাংশ কর্ম্মচারীর কাজ করে। বলা বাহুল্য, সকল বিষয়েই তত্ত্বাবধানের ভার ইংরেজেরই হাতে ন্যস্ত।

জাহাজ নঙ্গর করিবামাত্রই ডাক আসে ও টাকা ভাঙ্গাইবার ও জিনিষ পত্র বেচিবার জন্য লোক আসে। ভিন্ন ভিন্ন এজেন্ট আফিসের দালালেরা আসিয়া যাত্রীদের উঠানাবা কার্য্যে সাহায্য করিতে সচেষ্ট হইয়া ঘুরে।

তাঁদের দোকানপশার দেখিতে অনুনয় করে। তাহারা যে কত রকমের ভাষা জানে, তার অন্ত নাই। একজনের সঙ্গে ফরাসী ভাষায় কথা কহিয়াই অপর একজনের সঙ্গে তুর্কীতে কথা কহিল। অধিকাংশ লোকই ইংরেজী বুঝে, যদিও পূর্ব্বোক্ত দুইটি ভাষাই বেশী প্রচলিত। তাহাদের অনেকে হিন্দিও জানে। আমাদের কালো মুর্ত্তি দেখিয়া দেশ চিনিয়া বলে, —"কই জাগ্যা দেখনেকো যাইয়ে গা।" এ কথাটির মানে অনেক। তা সব শুনিয়া কাজ নাই। খবরের কাগজ ওয়ালারাও কাগজ বেচিতে আসে।

সে দেশের বিশেষ কিনিবার দ্রব্যসামগ্রীগুলি সব সুয়েজেরই মত। সেই মিশরের প্রত্নতত্ত্বের ছাপাবিশিষ্ট পোষ্টকার্ড, সুগন্ধ মধুর সিগারেট্, বস্ত্রবক্ষে ছবি আঁকা কার্পেট্, কাঁচ ও প্রবালের হাড়, মিশরের জন্তুদেহ-বিশিষ্ট দেবমূর্ত্তির পদক, আর সেই ছোট ছোট ফুলের খাতা। সেগুলি এমন মনোহর যে ইচ্ছা হ'ল সিন্দুকে ভরিয়া লইয়া গিয়া দেশে আপনার লোকদের দিই। আবার কিনিলাম, আর বহুক্ষণ হাতে করিয়া তার সুন্দর রঙ্গবেরঙ্গের উজ্জ্বল রেখাগুলি অনিমেষে দেখিতে লাগিলাম। ফুলের স্বভাবজাত সুগন্ধ তখনও তাতে ভরা।

প্রতি বন্দরে বন্দরে লোক বা মালপত্র নামাইবার আগে বন্দরের ডাক্তার আসিয়া লোকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে। তখন নাম অনুসারে সবাইকে সার দিয়া দাঁড়াইতে হয়; আর তিনি দেখিয়া যান। জাহাজের উপর এ সব নিয়ম ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রেরই মত কড়া। প্লেগ প্রভৃতি রোগ এক দেশ হইতে পাছে অন্য দেশে কেহ লইয়া যায়, এই আশঙ্কায় এত কড়া ব্যবস্থা। আর অত লোকের একত্র পরীক্ষার এতটা সুনিয়ম থাকায় এত অল্প সময়ের মধ্যে এত কাজ সমাধা হয়। ইহা দেখিলে, সুনিয়ম ও সুব্যবস্থার, কার্য্যের অল্পকালের মধ্যে সম্পাদন ও সিদ্ধি সম্বন্ধে কত যে প্রয়োজনীয়তা তা বুঝা যায়। ইউরোপের সকল জাতির ভিতর এইরূপ সুব্যবস্থা আছে; আমাদেরই নাই, তাই আমরা অব্যবস্থিত ও দীনহীন।

মিশরের একজন গণৎকার আসিয়া লোকের ভাগ্য গণনা করিল। সবাই তাহাকে হাত দেখাইবার জন্য ব্যস্ত; তার অধিকাংশই অল্পবয়সী রমণী। কতক্ষণ পরে হাসিতে হাসিতে এক সুহাসিনী তাঁর হাত বাড়াইলেন। গণক বলিল,—"বাঁ হাত দেখাও।"—"আমাকে কেহ কি ভালবাসে"? এই কথার উত্তরে গণক বলিল,—'অন্ততঃ ছয় জন তোমার প্রণয়ার্থী।' তিনি তাহাকে একটি শিলিং দিলেন। আর এক যুবা সওদাগর হাত দেখাইলে গণক বলিল—"তোমার মালপত্র সব অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইবে।" তিনি তাহাকে কিছুই দিলেন না। আর একজন ম্লানমুখী রমণীকে গণক বলিল—"তোমার প্রিয়জন অন্য রমণীতে অনুরক্ত"—তাঁর মুখ আরও বিষণ্ণ হইল।

একজন বাজীকর আসিয়া বাজী দেখাইল। এক সাহেবের ও এক মেমের নিকট হইতে এক একটি আংটী লইয়া গিলিয়া ফেলিল, পরে সেই আংটী দুইটি আবার তাহাদেরই আঙ্গুলে দেখা গেল—বদলা বদলী হইয়াছে। আর অমনি হাসির রোল।

নীচে জলের উপর ছোট বোটে করিয়া দুইটি ইটালীয় বালিকা ও দুইটি পুরুষ সেতার বেহালা ও ব্যান্‌জো বাজাইয়া গান শুনাইতে আসিল। যাত্রীরা তাহাদের মধুর গানে মুগ্ধ হইয়া জাহাজের উপর হইতেই তাহাদের ছোট ছোট রৌপ্যমুদ্রা ছুড়িয়া দিতে লাগিল। তাহারা ছাতা খুলিয়া সেইগুলি ধরিতে লাগিল, কিন্তু অনেকগুলি জলে পড়িয়া লোকসান হইল। তাহারা প্রায় আমাদেরই মত কালো। সাহেবদের ও মেমদের মত পোষাক পরা ও আমাদের দেশের মত কাল ঝাকড়া ঝাকড়া চুলবিশিষ্ট। আর সে মেয়ে দুটি কি ঠিক আমাদের বাঙ্গালী মেয়ের মত—তেমনি বড় বড় ভাব মাখান চোখ, তেমনি মুখের মধুর ভাব। ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপিয়ানদের রমণীর মত উজ্জ্বল বর্ণও নহে বা মুখের অমন স্বাধীন প্রদৃপ্ত ভাবও নহে। আর তাদের গানগুলিও অতি মধুর আমাদেরই গানের মত ভাবাতিশয্যে

ভাঙ্গা ভাঙ্গা ও কাঁপান সুর গিটকিরী ও গমকবিশিষ্ট। ইংরেজী গানের মত নির্লিপ্ত ও সোজা সোজা সুর নয়। সুরগুলি পরস্পরের সহিত কোলাকুলি করে—গাহিতে গাহিতে গায়কের ও শ্রোতার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হয় ও চোখে জল আসে। আর সে যন্ত্রের সঙ্গীতগুলিও কি মধুর ও সুশ্রাব্য। সবগুলিই তারের যন্ত্র, একটিও বাঁশী বা কোনওরূপ বায়ুযন্ত্র নাই। তারের যন্ত্রগুলির আওয়াজ স্বভাবত আরও নরম ও কোমল এবং চুপে চুপে কথা ও গুমরে কাঁদার মত অস্পষ্ট। বাঁশীর স্বর উচ্চ ও আকুলতা মাখা। রমণী হৃদয়ের মত অস্ফুট ভাবমাখা বলিয়া স্ত্রীকণ্ঠের সহিত গাহিতে পূর্ব্বটি আরও উপযুক্ত হয়। স্বর যত অনুচ্চ হয় ততই মধুর। তাই প্রতিধ্বনির অস্পষ্ট রব ও হৃদয়ের ভিতরকার নিস্তব্ধ সঙ্গীত-কল্পনার বিপুল বিস্তার সহায়তা করে বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা মধুর।

সৈয়দ্ বন্দর।

জাহাজ হইতে কিনারা অতি সন্নিকট। কিন্তু সেই অল্প পথই নৌকায় করিয়া নামিতে হয়। তার ভাড়াও অনেক; এমন ভাড়া কোথাও দেখি নাই। দিনের বেলা প্রতি জনা পিছু তিন আনা লাগে আর রাত্রি বেলা ছয় আনা। পূর্ব্বে নাকি আরও বেশী ছিল। সুলতানের আমলে যা চাহিত তাই দিতে হইত। মাঝিরা নাকি নৌকা আধ পথে লইয়া গিয়া আর যাইব না বলিয়া, ভয় দেখাইয়া বেশী ভাড়া আদায় করিত। এখন ইংরেজের শাসন আমলে সবই নিয়মে বাঁধা।

নামিবামাত্র একজন তুরস্কদেশীয় ভদ্রলোক হাত বাড়াইয়া আমাদিগকে উপরে উঠাইয়া লইল এবং বলিল—"আপনারা কি স্থানটি দেখিতে ইচ্ছা করেন? আমি একজনা প্রদর্শক। আমাকে দু-সিলিং দিলেই আমি আপনাদের সব স্থান দেখাইয়া আনিব।" আমরা সম্মত হইয়া একখানি ভাড়া ফিটন্ লইয়া দেশ দেখিতে চলিলাম। ফিটন্ খানি রবার টায়ার দেওয়া ও প্রতি ঘণ্টায় তার দুই শিলিং ভাড়া।

সহরটি নূতন, রাস্তাগুলি চওড়া। বাড়িগুলি সারি সারি গাঁথা; তার নীচেতলা সবই দোকান। দোকানগুলি অতি সুসজ্জিত এবং দেশীয় ও বিদেশীয়; তাতে নানারূপ জিনিষ বিক্রয় হয়। অধিকাংশ দোকান ফরাসী জাতীর বা মুসলমানের হাতে। ইংরেজের হাতে অল্পই আছে। সবাই ফরাসী ভাষা কয়। অষ্ট্রীচ্-পালক, ইজিপ্টের প্রত্নতত্ত্বের ছবি, নানারূপ পরিধেয় দ্রব্য সামগ্রী ইত্যাদি। বড় রাস্তার ধারে ধারে ও সমুদ্রের তীরে বাঁধা রাস্তার উপর অনেক মদের দোকান। তাকে ফরাসী ভাষায় 'কাফি' বলে। অর্থাৎ সেইখানে মদ "কাফি-চা" ইত্যাদি পাওয়া

বিহীন কাফি পান করা হয়; আর তার সঙ্গে মদ। অনেকগুলি বেকার বদমায়েস্ সেইখানে বসিয়া দিন রাত আড্ডা দেয়। সুবিধা পাইলে লোকদের ঠকায়। অনেকগুলি ইটালিয় বালিকা এখানে থাকিয়া—কনসর্ট বাজাইয়া ও গান গাহিয়া লোকদের মনোরঞ্জন করে। সেটি একটি এখানকার প্রধান আকর্ষণ। কারে প্রকারে অনেক লোক দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় ফাঁদে পড়িয়া যান। নিকটেই জুয়া খেলা হচ্চে। অনিচ্ছুক বিদেশী হয় ত অনেক আপত্তির পর রাজী হইয়া এক দান খেলিলেন। বিস্তর জিত হইল; আবার খেলিলেন,—আবার জিত হইল। নেশা চড়িতে চড়িতে এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, শেষে সর্ব্বস্ব সেই খানে দিয়া জাহাজে ফিরিয়া আসিলেন।

হয় তো একজন সুবেশী ছোট ছেলে এসে বল্লে—"মহাশয়, গান শুনবেন তো আমার সঙ্গে আসুন।" যদি কোনও মূঢ় তাদের সঙ্গে যায়, তো নিমেষে কুটকচালে পথ দিয়ে এমন স্থানে নিয়ে গিয়ে ফেলে, যেখান থেকে ইজ্জত নিয়ে ফিরে আসা দায়। হয়ত সে বাড়ির সিঁড়ির পংক্তি-গুলি সরু, অন্ধকার ও আঁকা-বাঁকা। তার উপরে সুসজ্জিত বড় বড় আয়নাবিশিষ্ট ও নানারূপ চিত্তবিকারী ছবি দিয়ে সাজান প্রকোষ্ঠ। আলবোলায় তাওয়া দিয়ে তামাক সাজা; আতর দানে আতর প্রভৃতি দেখা যায়। নূতন মখমলের সোফার উপর বসিয়া কেহ হয় ত অনন্য ভাবে ধূমপান করিতেছেন। সেই খানেই আবার কত রকমের তাস্ ও ছবি বিক্রয় হয়,—তা অমনি দেখিলে এক রকম; আবার রোদে দেখিলে আর এক রকম। ইত্যাদি নানারূপ বিপদ-সঙ্কুল স্থানে সে বন্দরটি পরিপূর্ণ।

যেমন করে থাকি, প্রথমেই পোষ্টাপিসে গেলাম। সেখানে ইজিপটিও ষ্ট্যাম্পই প্রচলিত—তার দাম একপেনীর কিছু উপর। অন্যান্য দেশেরও

সেই দেশেরই পোষ্ট বাক্সে ফেলিতে হয়। অঙ্গের অন্য দেশের বাক্সে ভুলিয়া দিলেও চিঠি পৌঁছাবে। তবে সেখানে দুনা দাম দিয়া লইতে হইবে। ঠিক এইরূপ চীন দেশের এময় সহরেও দেখিয়াছি। যেখানেই বিভিন্ন জাতির পাঁচ জনের একত্র ক্ষমতা বিস্তার, সেখানেই এইরূপ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সকল আক্রুর দেশে রাস্তায় প্রায়ই স্ত্রীলোক দেখা যায় না। যে দুই একটি দেখা যায়, তাহাদের মুখের নীচেটি ঘোমটায় আবৃত। আমাদের দেশের ঘোমটায় চোখ ঢাকা থাকে বলিয়া হুচট খাওয়ার ভয়। তাদের মুখের নীচে ঢাকা কিন্তু চোখ খোলা। সে ছবি গেল বারে "আরব রমণীর" ছবিতে দেখাইয়াছি। অঙ্গের অন্য কোনও জায়গাই ফাঁক নাই বলিয়াই ইহারা নাকের উপরই যা কিছু গহনা পরিবার আছে তাই পড়েন। বলা বাহুল্য যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ঘোমটায় ঢাকিয়া জহরতের সৌন্দর্য্যের বিকাশ করা সে চেষ্টা মিথ্যা চেষ্টা।

অতি অল্পদূর যাইয়াই গ্রীক দেশের গীর্জ্জায় ঢুকিলাম। তার সামনে একটি বাগানে একটি ইউরোপীয় রমণী নিজেই বাগান খুঁড়িতেছেন। তাঁহার শরীর যেমন সুস্থ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গও তেমনি পরিপাটী। মুখে স্বাধীনতা ও আনন্দের ভাব। গীর্জ্জাটি অন্য গীর্জ্জারই মত উচু চূড়া বিশিষ্ট। তার উপর হইতে মধুরস্বরে উপাসনার ঘণ্টা বাজিতেছিল। সামনেই কতকগুলি প্রাচীনা রমণী দাঁড়াইয়া নতশির হইয়া, উপাসনায় রত হইলেন। একটি ভিক্ষুকও কান নাক ছুঁইয়া কুর্ণিস করার মত করিয়া পূজায় যোগ দিল। দূরেও যে যেখানে ছিল ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া চোখ বুজিল। ঘণ্টার রবে এমন কি অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা আছে যে, তাতে মনের কর্ম্মোন্মুখী ভাব ও শরীরের গতিবিধি সব তখনি তখনি একেবারে বন্ধ করিয়া দেয়। প্যারিশে লুভেয়ারের আর্ট গেলারীতে একটি ছবি দেখিয়াছিলাম—তাতেও এইরূপ আরব ছবি ছিল। চিত্রমধ্য

"মলিয়ারেরই" আঁকা। সরল হৃদয় কৃষক ও তাঁহার পত্নী মাঠে একত্রে কাজ করিতেছিলেন। এমন সময়ে দূরে নগরের ধর্ম্ম মন্দির হইতে সন্ধ্যা উপাসনার ঘণ্টা ধ্বনি উঠিল। যাই সেই মধুর বোল তাঁহাদের কানে পৌঁছিয়াছে অমনি যিনি যেমন অবস্থায় ছিলেন, ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন। সে যে মুদিত নেত্রের ও নত মুখের মধুর ভাব, এমন কোথাও দেখি নাই। কবির তুলিকা রমণীর নত মুখের কপোলে অস্তমান সূর্য্যের একটি সুরঞ্জিত রশ্মি প্রতিফলিত করিয়া আরও স্বর্গের ভাব আনিয়াছেন। এই বিষয়েরই একটি ছোট ছবি আমি সঙ্গে আনিয়াছি।

মন্দিরের ভিতর ঢুকিয়া দেখি, তাতে অধিকাংশই বৃদ্ধাস্ত্রীলোক। চারিটি মাত্র পুরুষ আছে। তাহারাও সব অতি বৃদ্ধ। সকল দেশেই এইরূপ ঘটে—ধর্ম্মের টানে সরল হৃদয়া স্ত্রীলোকেরাই বেশী আকৃষ্ট হয়েন। আর বৃদ্ধ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দৌর্ব্বল্যের অসহায় ভাব বৃদ্ধি পাওয়াতে সকল বিবেক ও ধর্ম্মভাব আরও ঘনীভূত হয়।

সে ধর্ম্মমন্দির আমাদেরই ধর্ম্মমন্দিরের মত, তাতে নানারূপ প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত ও পূজিত। যীশু খৃষ্টের নানা অবস্থার মূর্ত্তি আছে। মাতৃকোলে শিশু অবস্থারই মূর্ত্তি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দেখায়, আর ক্রুশে বিদ্ধ তাঁহার শিথিল দেহই সর্ব্বাপেক্ষা পূজিত। কেথলিক চার্চ্চে কুমারী মেরীর খৃষ্ট অপেক্ষাও আদর। প্রচারক সন্ন্যাসী পলের প্রস্তর মূর্ত্তির বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ উপাসকদের চুম্বনের ঘর্ষণে একেবারে খইয়া গিয়াছে। চারিদিকে মোমবাত্তি জলিতেছে—ও নানা রঙের কাপড় দিয়া সাজান। ফুলও আছে—ধূপ ধূনাও জ্বলিতেছে। জর্ডন্ নদীর পবিত্র জল স্পর্শ করিয়া যাত্রীরা উপাসনায় রত হয়। সবই প্রায় আমাদের দেশেরই মত। এও একরূপ নূতন মূর্ত্তি পূজা। ঈশ্বরের কল্পনা মানবের আদি অবস্থায় এইরূপ স্বরূপভাবেই আবির্ভাব হইয়াছে। ক্রমে নিরাকার কল্পনায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। খৃষ্টির

কেথলিকদের এ সব সরঞ্জম ইহা হইতেও কম। Protestant Church এর আবার আরও কম। মুসলমান ধর্ম্মে আবার আরও বিরল। এমন কি, তাঁহাদের বৈঠকখানার ঘরে তাঁরা ছবি অবধি থাকিতে পারে না পাছে প্রতিমা পূজায় প্রবৃত্তি আসে। গীর্জ্জায় ঘণ্টা বাজান অবধি নিষিদ্ধ। মানুষে মসজিদের উপর হইতে চীৎকার করিয়া সেই কাজ করে থাকে। অথচ সকল সম্প্রদায়েরই বিধান মতে অপরের প্রণালী ঠিক নহে বলিয়া বিবেচিত।

এখান হইতে গাইড্ আমাদের একটি মুসলমান মসজিদে লইয়া গেল। জুতার উপর একটি নেকড়ার জুতা পরিয়া তবে তাতে প্রবেশ করিতে হয়। মোল্লার বেদী দেখিলাম। কতকগুলি ছোট ছেলে কোরাণদানে বই রাখিয়া পড়িতেছিল। কোরাণসরীফ্ও দেখিলাম, মহম্মদের নিজ হাতের তরবারিও দেখিলাম। মহরমের বিষম লম্বা ধ্বজাও দেখিলাম। একজন মোল্লা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে আমাদের মহম্মদের জীবন বৃত্তান্ত ও এই মন্দিরটির উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। তাহারা বড় গরীব। আসিবার সময় আমরা কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাদের হাতে গুটিকতক রৌপ্য মুদ্রা দিলাম—সেই অল্পেই তারা কত সন্তুষ্ট।

তিনি যে মহাম্মদের জীবন বৃত্তান্ত আমাদের বলিলেন, তাহা আমার কাছে সম্পূর্ণ নূতন কথা ও আমার অতিশয় বিস্ময়জনক বলিয়া মনে হইল। সেই মহাত্মার পুণ্য জীবন কাহিনী সম্বন্ধে দুই একটি কথা নিম্নে বলিতেছি।

মহম্মদের ইতিবৃত্ত সেই মোল্লার মুখ হইতে আমি নিবিষ্টচিত্তে শুনিয়াছি ও একান্ত কৌতূহলবশত, দু-একখানি পুস্তক হইতেও পরে পড়িয়াছি। তাঁর জন্মিবার কিছুদিন পূর্ব্বেই তাঁর পিতা আবদুল্লা মারা যান। তাঁর মাতা "আমিনা" তাঁকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ করিবার জন্য "হমিনা" নাম্নী এক ধাত্রীর কাছে মানুষ করিতে দিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইনি বুডীন্ জাতীয়া স্ত্রীলোক ; মরুভূমেই ইহাঁদের বাস। মহম্মদ এই স্থানেই

কিন্তু ছেলেবেলায় তাঁহার ফিট বা মূর্চ্ছা হইত। কিছুদিন পরে তাঁর মাতাও মারা যান। তখন তাঁহার মামা "আবুতালিপ্" তাঁহার ভরণ-পোষণের ভার লয়েন। এই সময়ের সকল ছেলেই যেমন সেকালে সে দেশে করিয়া থাকিত, এই বয়সে তিনি মরুভূমির মাঝে পাহাড়ে পাহাড়ে মেষ চরাইয়া বেড়াইতেন। সেই ভীষণ স্থানেই প্রকৃতির ভীষণ শোভা দেখিয়া তাঁর ভাবুক মনে ধর্ম্ম ভাব আসে। সে সময়ে আরব দেশের সমাজ ও ধর্ম্ম অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল ছিল। সকলেই মূর্ত্তি পূজা করিত। স্ত্রীলোকের অবস্থা অতিশয় হীন ছিল। মানবহিতব্রতে ব্রতী হইয়া এই সকল কুপ্রথার সংস্কার-সাধনে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। অনন্যমনে এই সকল নির্জ্জন প্রদেশে আহার নিদ্রা ভুলিয়া তখন অহরহ এই চিন্তাই করিতেন। এক সময় তাঁহার মনের অবস্থা এমন বিশৃঙ্খল হইয়াছিল যে, তিনি পাহাড়ের চূড়া হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে যাইতেছিলেন; এমন সময় স্বর্গীয় দূত "গেব্রীয়েল" তাঁহাকে বাঁচাইলেন। এই ঘটনাগুলি অনেকটা যিশুখৃষ্টের জীবনীর মত (Jeasus in the wilderness)। মহাপুরুষদের জীবনে অমনি একদিন দারুণ পরীক্ষার দিন আসে। পূর্ব্বোক্ত এই ঘটনাগুলি হইতেই তাঁহার ভবিষ্যতের যাবতীয় কার্য্যপ্রণালী সব বুঝা যায়।

তাঁহার যৌবনের আর একটি মহৎ ঘটনা "খাদিজা" নাম্নী এক রমণীর সহিত তাঁর বিবাহ। ইনি একজন ধনী বিধবা রমণী ছিলেন। এবং ইহারই কাছে মহম্মদ চাকরী করেন। পরে তিনি প্রীত হইয়া মহম্মদকে বিবাহ করেন। তিনি বয়সে ১৫ বৎসরের বড় থাকিলেও সারা জীবন মহম্মদের সঙ্গে অতি সুখে একত্র বাস করিয়াছিলেন। মহম্মদ ইহাকে বড়ই মান্য করিতেন ও তিনিও মহম্মদকে বড়ই ভক্তি করিতেন। তিনটি মেয়ে ও দুটি ছেলে হয়। ছেলে দুটি মারা যায় এবং ছোট মেয়ের বংশধরেরাই মহম্মদের বংশ রক্ষা করে; ইহার ছেলেদের নামই "হাসেন্"

খাদিজার মৃত্যুর পর মহম্মদ আরও দশবার বিবাহ করিয়াছিলেন। কাহারও সন্তান হয় নাই। তবে তাঁর অতি বৃদ্ধ বয়সে "মেরি" নামক এক খৃষ্টান রমণীর গর্ভে একটি ছেলে হইয়াছিল। মহম্মদ সে ছেলেটিকে বড়ই ভাল বাসিতেন। কিন্তু সেও বাঁচে নাই। একটিও পুত্র সন্তান না থাকায় কে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কার্য্যের ভার লইবে এই চিন্তায় মহম্মদ্ বড়ই কাতর থাকিতেন।

যখন প্রচলিত ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করাতে দেশের লোক তাঁহার উপর খড়্গ হস্ত হইল, তখন তাঁহাকে মক্কা ছাড়িয়া মদীনায় পলাইতে হইল। একেই "হিজরী" বলে। ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহেই তাঁহার সময় কাটিত, তারই কিঞ্চিৎ অবসরকালে তিনি "কোরাণ" বলিতেন। ৬৪ বৎসর বয়সে ১৫ দিনের জ্বরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রিয়তমা স্ত্রী "আয়েষার" ঘরেই তিনি দেহত্যাগ করেন। পরে "কোরাণ সরিফ্" লেখা ইহারই ঘরে পাওয়া যায়।

মহম্মদের জীবিত অবস্থাতেই মুসলমানধর্ম্ম বহুদূর অবধি বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্মকে 'ইসলাম্' ধর্ম্ম বলা যায়। এই ইসলাম শব্দের অর্থ "ঈশ্বরের ইচ্ছায় সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা।" তাঁহার ধর্ম্মের মূলমন্ত্র এই যে—"ঈশ্বর এক ; আর মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত (তত্ত্ববক্তা)।" এ ধর্ম্মের নিয়মানুসারে জাতিভেদ নাই। সকল মানুষই সমান, পরে মহম্মদের মৃত্যুর পর অল্পকাল মধ্যেই এই ধর্ম্ম চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল। এখন পৃথিবীর ভূভাগের চার ভাগের এক ভাগ লোক এই ধর্ম্মাবলম্বী।

এই মসজিদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সেখানকার হাঁসপাতাল দেখিতে গেলাম। ছোট বাড়ী কিন্তু ফুলবাগানে ভরা। একজন আরমানী ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত। তিনি আমাদের কাফী পান করাইলেন ও পরে আপনিই সঙ্গে করিয়া সেখানকার সকল ঘর দেখাইলেন।

সেখানে অল্পসংখ্যক মাত্র রোগী বিনা বেতনে থাকিতে পায়। অপর সকলকেই টাকা দিয়া থাকিতে হয়। প্রথম শ্রেণীতে ১০ ডলার প্রতিদিন দেয়। স্নান করিবার, কাপড় কাচিবার, রাঁধিবার, ও রোগীদের রাখিবার সুন্দর ব্যবস্থা। স্ত্রীলোকেরা যেখানে থাকেন, সে স্থানটি দুই ভাগে বিভক্ত—এক ভাগে গৃহস্থ মেয়েরা থাকেন, ও অপরটীতে সাধারণ কুশীলা স্ত্রীলোকদের স্থান। তাদেরও অনাবৃত মুখের ভাবে স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ সঙ্কোচ মর্য্যাদাও সাবল্য আছে। আমাদের হাঁসপাতালে এ দেশে এমন সুন্দর ব্যবস্থা এ বিষয়ে নাই।

এখান হইতে তিন মাইল দূরে "অরব পল্লী" দেখিতে গেলাম। সে সহরের বাহিরে স্থান তত পরিষ্কার নহে। ছোট ছোট কুঁড়ে ও অপ্রশস্ত রাস্তা ময়লায় ভরা। গরীব স্ত্রীলোকেরাও ময়লা পোষাক পরা ছেলেপিলে চতুর্দ্দিকে দেখা গেল। স্ত্রীলোকদের প্রায় সবই অবগুণ্ঠিতা।

শেষে পিয়ারে "লেসেপ্স" এর (Ferdinand Lesseps) প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে গেলাম। সেই স্থানটিই সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। সহরের জমী হইতে বড় বড় পাথরে গাঁথা প্রাচীরটি সমুদ্রের ভিতর ১ মাইল অবধি গিয়াছে। সেই স্থানে সহরের যত লোক হাওয়া খাইতে যান। সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গ যাহাতে বন্দরে ঢুকিতে না পারে, সেই জন্য এই প্রাচীর গাঁথা। ভীষণ তরঙ্গ আসিয়া অহরহ তাহাতে আঘাত করিতেছে। আর সে জলকল্লোল কি ভীমনাদ। ঢেউ চলিয়া গেলে, শুভ্র ফেনাগুলি যেন সাদা ফুলের মত বেলাভূমিতে পড়িয়া থাকে। আর শত শত জলজ উদ্ভিদ ও সজীব শেওলা সেই স্রোতে অনবরত পাথরের উপর আহত হইতেছে। "জেলি মাছই" বা কত—তারা নানা রঙ্গের রঞ্জিত বিচিত্র ছাতা খুলিয়া জলের নীচে সাঁতার দিতেছে। ঢেউগুলির তুমুল আলোড়ন যেন জলদস্যুদের আক্রমণের মত মনে হয়। যেন প্রবলবেগে পাথরের প্রাচীরটি ভাঙ্গিয়া

দিয়া বড় বড় ঢেউগুলি দেশটি জলপ্লাবনে নষ্ট করিতে চায়। দ্বারিকা ধ্বংসের কালে এইরূপ দৃশ্যই বোধ হয় বর্ণিত আছে।

এই পাথরের প্রাচীরের সমুদ্রপ্রান্তে "লেসেপ্স্" এর প্রতিমূর্ত্তি এক উচু থামের উপর অবস্থিত। এক হাতে চাবী ও অপর হাতে সুয়েজ খালের ম্যাপ হাতে করিয়া কর্ম্মবীর সমুদ্রের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া আছেন। খাল কাটিয়া সাগর বাঁধিয়া যেন তিনি সেখানে দাঁড়াইয়া ভীষণ সমুদ্রের উপর প্রভুত্ব করিতেছেন। ইনি একজন ফরাসী দেশীয় এন্‌জিনিয়র্। কত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া মরুভূমির উপর দিয়া ছোট ছোট হ্রদ গুলিকে একত্র করিয়া এই অসম্ভব কাজ সম্ভব করিয়াছেন। যে স্থানে যাইতে পূর্ব্বে তিন মাস লাগিত, এখন এক মাস লাগে। এখন ব্যবসা বাণিজ্যের কত সুবিধা হইয়াছে ও ইউরোপের সহিত কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। তার ফল, এক হিসাবে ভীষণ হইয়াছে। অনেক আসিয়াবাসী এই দারুণ জীবনসংগ্রামে মরিতেছে। তবে তাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক যাহারা বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে, তাহারা নূতন অবস্থার আলো পাইয়া ও তদ্দ্বারা আরও বলীয়ান হইয়া, সুদূর ভবিষ্যতে হয়ত দুই শক্তির সংমিশ্রণে অনেক খেলা খেলিতে পারিবে—আশা করা যায়।

ইহারই নিকট জমীর উপর Maconigraph মার্কণীর তারবিহীন টেলিগ্রাফের স্তম্ভ। প্রতি বন্দরেই এরূপ ব্যবস্থা আছে। শীঘ্র খবরাখবরে ইহা বড়ই সুবিধাজনক। খবর পাঠাইবার কালে আকাশে যে বৈদ্যুতিক ঢেউগুলি হয়, সেগুলি চারিদিকের ঘোষণাস্থান দিয়া ছড়াইয়া পড়ে বলিয়া থামের মাতায় উচু স্থানই যন্ত্ররক্ষার পক্ষে সুবিধাজনক।

ভূমধ্যসাগর ও মিশরদেশ।

বেলা চারিটার সময় আমরা সৈয়দ বন্দর ছাড়িলাম। এইবার আসিয়ার সহিত সকল সম্পর্ক ঘুচিল।

ঠিক জাহাজখানি ছাড়িবার কালে একখানি মুসলমান তীর্থযাত্রীর জাহাজ বন্দরে আসিল। তাতে ঠিক ভেড়া বোঝায়ের মত সব ময়লা কাপড় পড়া নানাদেশের মুসলমান তীর্থযাত্রী মক্কা হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল। আমাদের সীতাকুণ্ডের মত নিকটেই "মেজেস্এব কূপ" নামক একটি তীর্থ আছে, সেথানে অনেক যাত্রী যায়। সে দৃশ্য দেখে আমার আমাদের দেশের তীর্থ-যাত্রীদের কথা মনে হলো। কি অসহায় হইয়া এই সকল লোক পরের হাতে এত লাঞ্ছনা সহিতেছে। এসিয়াবাসীর এবংবিধ ও অন্যান্য নানাপ্রকার অব্যবস্থার কথা ভাবিতে ভাবিতে এবং আসিয়া ভূমিখণ্ডের দিকে শেষ দেখা দেখিতে দেখিতে আসিয়া ছাড়িয়া চলিলাম। ভূমধ্যস্থ সাগরের ভিতর দিয়া জাহাজ এইবার উন্নতিশীল ইউরোপের পথে চলিতে লাগিল।

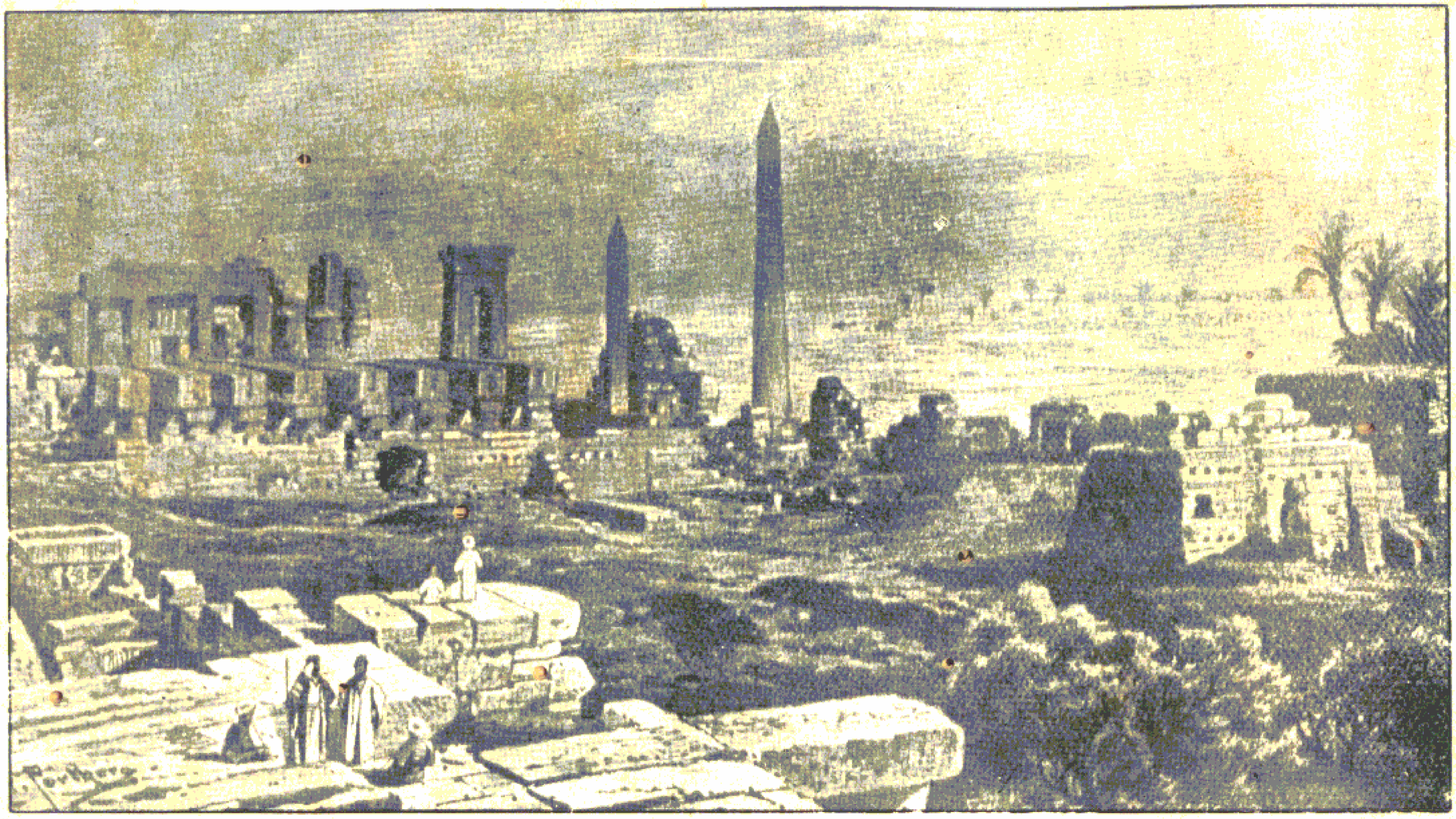
বন্দর হইতে বাহির হইবার কালে সকল জাহাজকে সে সমুদ্রভিতরকার পাথরের প্রাচীর ও লেসেপ্‌সের মূর্ত্তি ঘুরিয়া যাইতে হয়। সমুদ্র হইতে জমীর দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। সহরের উচু উচু বাড়ীগুলি সব সারিদিয়া তীরে দাঁড়াইয়া আছে। তার মাথায় ব্যবসাদারদের কতরকমের সাইন-বোর্ড আঁটা। কত হোটেল, কত দোকান, কত নাচ ঘর। সর্ব্বাপেক্ষা তারহীন টেলিগ্রাফের থামটি উচু। তার উপরে আকাশের বৈদ্যুতিক ঢেউ লইবার ও ঢেউ দিবার কত যন্ত্র আছে। সমুদ্র হইতে দেখিতে লেসেপ্সের ছবিটির আরও গম্ভীর মূর্ত্তি। বাস্তবিকই যেন সমুদ্রবক্ষে দাঁড়াইয়া ঈশ্বর সাগরের উপর প্রভুত্ব করিতেছেন।

ক্রমে যত জাহাজ দূর হইতে দূরে যাইতে লাগিল, জমীর রেখাও তত ক্ষীণ হইতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা আকাশে মিশরের অস্পষ্ট ক্ষীণ রেখা যেন সুদূর অতীতের স্বপ্নরাজ্যের মত মনে হইতে লাগিল।

সে রাজ্য বাস্তবিকই স্বপ্নরাজ্য। পৃথিবীর যত রাজ্যের ইতিহাস জানা আছে—মিশরই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। এমন কি খৃষ্টপূর্ব্ব দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বেরও সংবাদ কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। খৃষ্টের পরে আজ এখনও দু হাজার বৎসর হয় নাই। সে এত দিনের পুরাতন রাজ্য। সুদূর অতীতের আবরণ উন্মোচন করিয়া মিশরের যে সকল পুরাতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে—সেও অতি বিস্ময়কর কথা। সেই কারণেই স্বপ্ন-রাজ্যের সহিত তাহার তুলনা দেওয়া কিছু অন্যায় নহে।

অথচ সে সকল আবিষ্কৃত তত্ত্বের যথার্থ ভাল ভাল প্রমাণও আছে সেগুলি নিতান্ত অলিক কথা নয়। মিশর দেশ আরবেরই মত একটি মরুভূমিময় দেশ। কেবল তার মধ্য দিয়া নীলনদী প্রবাহিত হইয়া তাহার সামান্য কতক অংশকে বাসোপযোগী করিয়াছে। বর্ষাকালে সেই নীল নদীতে বিপুল জল নিকাস হওয়ায় বন্যা হয় ও সেই জল প্লাবনেই চারিদিকের শস্যক্ষেত্রে জল পায়। চাষ করিবার উপযোগী জমী অত বড় দেশে অতি অল্প। তাই সেকালে জমীর অত আদর ছিল। এক সামান্য অংশও তাই এত হিসাবের উপর রাখা হইত বলিয়া এই দেশেই জ্যামিতি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। সে শাস্ত্র আর কিছুই নয়—সূক্ষ্মভাবে জমী মাপিবারই শাস্ত্র।

খৃষ্ট পূর্ব্ব দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নীলনদীর ধারে অনেক সমৃদ্ধি-শালী ও সুসভ্য সহরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সঠিক খবর পাওয়া যায়। "কেরো" তার মধ্যে একটি প্রধান স্থান। এই সময়ে তার নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেকগুলি পিরামিদ তৈয়ারী হয়। সেগুলি এখনও তেমনি ভাবে বিদ্যমান। সেগুলি সব ইজিপ্টের রাজাদের গোরস্থান ছিল। সব



মিশর দেশের কার্ণাক নামক পুরাতন স্থানের ভগ্নসমৃদ্ধি ও স্মৃতি-চিহ্ন।

খান থান পাথরে মজবুত করিয়া গাঁথা, এত শতাব্দী পরেও পূর্ব্ববৎই আছে। তাতে বিস্তর রাজাদের গোর আছে। এক একটি তৈয়ারী করিতে হিসাবে ১ লক্ষ লোককে ২০ বৎসর খাটিতে হইয়াছে। এই সকল পিরামিদের ধারেই "ফিনিক্স"এর প্রকাণ্ড প্রস্তর মূর্ত্তি মরুভূমির বালুতে কতক প্রোথিত আছে। সে আবার পিরামিদ হইতেও পুরাতন। এটি একখানি প্রকাণ্ড কাল পাথরে খোদা মনুষ্য ও জন্তু মূর্ত্তি। পুরাতন মিশর দেশের প্রধান দেবতা সূর্য্যদেবেরই প্রতিমূর্ত্তি ছিল।

এত পরিশ্রম ও খরচ করিয়া পিরামিদ নির্ম্মাণের কি আবশ্যক ছিল এ কথার উত্তর দিতে হইলে মিশরের পুরাতন ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। সকল পুরাতন জাতিরই মত তাঁহারাও পৌত্তলিক ছিলেন ও বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস করিতেন। আর তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে মৃত্যুর পর আত্মা দেহের নিকটেই ঘুরিয়া বেড়ায় ও আহার পানীয় ও ভোগবিলাসের আশায় সর্ব্বদা অস্থির হইয়া ফিরে; এবং সুদূর ভবিষ্যতে আবার সেই আত্মা সেই দেহেই ফিরিয়া আসিবে। এই আত্মার ফিরিয়া আসার আশাতেই মৃতের দেহরক্ষার উপর লোকের এত ঝোঁক পড়িল। সেই আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ আত্মার ভোগ বাসনা নিবৃত্তি করিবার জন্য সে কবরের ভিতর আহার্য্য বসন ভূষণ প্রভৃতি সকল দ্রব্যই দেওয়া হয়। আর সকল রকম সামাজিক ঘটনাবলিও সেই পাথরের গোরের ভিতর দিকে ছবি চিত্রিত আছে। তার ভিতর নানারূপ চিত্র বিচিত্র করা মাটির ও ধাতুর তৈজসপত্রও থাকে। এই সকল ছবি হইতেই প্রাচীন মিশরের পুরাতত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এ আবিষ্কারগুলি কিছুই অন্যায্য বা অলীক কল্পনা নহে।

এই সকল হইতেই জানা যায় তাঁদের রীতি নীতি আচার ব্যবহার সভ্য জাতিরই মত ছিল। তাঁদের রাজা "ফেরোয়া" তাঁদের পুরোহিত ও দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণদের মত তাঁদের দেশেও এক শ্রেণীর পুরোহিত ছিল, তাঁদের পদ সাধারণ লোকের

অপেক্ষা অনেক উচ্চ। তাঁদের দেশে, চীন দেশ ও পূর্ব্বেকার আমাদের দেশেরই মত, বিদ্বান লোকের বড়ই আদর ছিল। কিন্তু তাঁরা পুরোহিত হইতে এক স্বতন্ত্র জাতি ছিলেন। সরকলর্মে পেপিরস্ গাছের বল্কলে তাঁহারা বহুবিধ পুস্তক লিখিতেন। তখনকার জ্যোতিষ চিকিৎসাদি নানা বিদ্যায় তাঁহারা সুপণ্ডিত ছিলেন। তখনও সেথায় ধাতু দ্রব্যের প্রচুর ব্যবহার ছিল ও তাঁতি ছুতর কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর কারীগরই বিদ্যমান ছিল।

এই গেল পুরাণ মিশরের ইতিবৃত্ত। সেই স্থানের নিকট "চালডিয়া" দেশের রাজধানী "ব্যাবিলন্" দেশও অতি পুরাতন। পুরাতন মিশরে ছবি লিখিয়াই বর্ণমালার প্রথম উত্থান হয়, মানুষ বুঝাইতে একটি মানুষই লিখিতে হইত। ক্রমে সে দিন গিয়া অনেক পরিবর্ত্তনের পর আধুনিক হরফে দাঁড়াইয়াছে। বেবিলনে এই লেখা বিভিন্নদেশের বর্ণমালার জন্মদাত্রী। সোজা সোজা তীরের অক্ষরে খোদা হইত। এইটি আবার মিডিয়া দেশ দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া অশোক লিপির অক্ষর হয়। ইহা হইতে আমাদেরও সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অক্ষরের উৎপত্তি।

নিউবিয়া মিশরেরই দক্ষিণে। সে দেশের সহিত, প্রতিবাসীর সহিত যেমন হয়ে থাকে, মিশরের চিরবিবাদ ছিল। একটি রাজার গোরের ভিতর ছবি আঁকা আছে; তাতে একটি ছবি এই,—তাঁর কাছে যুদ্ধে হার মানিয়া নিউবিয়ার রাজা নানারূপ উপঢৌকন লইয়া তাঁহাকে ভেট দিতে আসিতেছে। ব্রিটিশ মিউজিয়মের তিনটি দালান্ এই সকল মিশরের পুরাতত্ত্বের-দর্শনীতে পূর্ণ। সে এরূপ সুন্দররূপে সাজান ও বিস্ময়কর যে সে ঘরে ঢুকিয়া জিনিষগুলি দেখিলেই মানব জাতির আদি উৎপত্তির বিবরণ যেন স্বচক্ষে সুস্পষ্ট দেখা যায়। মানব আদিম বর্ব্বর অবস্থা হইতে ক্রমে সভ্য হইয়া আজকালকার সুসভ্য জাতিতে পরিণত হইয়াছে। নিচু হইতে উপর অবধি সবাই একটি অনন্ত শ্রেণীর এক একটি পদ বিশেষ।

মিশর পূর্ব্বে বহু পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। নিকটবর্ত্তী অন্য সকল স্থানে ক্ষমতা বিস্তার করিয়া পরে ইহুদীজাতিকেও জয় করিয়াছিল। তাঁহারা মিশরে অনেক দিন বন্দী ছিলেন। পরে মোসেস্ তাঁহাদিগকে সেস্থান হইতে উদ্ধার করিয়া আনেন। সেই সময়ে মিশরের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ সূচনা করিয়া মিশরে কত দৈব উৎপাত হয়। আমাদের দেশেরই মত Plague বা মহামারী ঘটিয়াছিল। সবাইকার ঘরে সর্ব্বের বড় ছেলেদের সব মৃত্যু হইতে লাগিল; জলপ্লাবনে দেশ রাখা দায় হইল; পঙ্গপাল আসিয়া ক্ষেত্রের পাকাশস্য ছারখার করিয়া দিল। এই উৎপাতের সুযোগেই ইহুদীরা ঈশ্বর অনুগ্রহে প্রকাশিত লোহিত সমুদ্রের জলের মধ্যে শুকনা পথ দিয়া সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরেরই সাহায্যে পলাইয়া আসিতে পারিয়াছিলেন।

এইস্থান হইতেই প্রথমে গ্রীসে সভ্যতা যায়, কিন্তু পরে গ্রীকরা আসিয়াই আবার মিশর জয় করিয়া তথায় নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন করেন। মিশরের রাজা টলেমী ও রাণী ক্লিওপ্যাট্রা এই বংশেরই লোক। রাণী ক্লিওপ্যাট্রার ইতিহাস সর্ব্বজনবিদিত, তবুও অতি বিস্ময়কর কথা বলিয়া আমি পরে তাহা সবিস্তারে বলিতেছি।

গ্রীক্‌দের পরে রোমানরা মিশর জয় করেন। পরে রোমরাজ্যের ধ্বংসের সময় মিশর আবার একরূপ স্বাধীন হইয়াছিল। মুসলমানধর্ম্ম প্রচার হইবার সময় মূরযুদ্ধে মুসলমানেরা মিশর জয় করেন, ও অন্যান্য মন্দির ও দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে মিশর দেশের অনেক দিনের বিখ্যাত লাইব্রেরীটিও পুড়াইয়া দেন। সেই হতেই ইউক্লিডের কয় বই জ্যামিতি ধ্বংস হইয়া গেল। এখন মিশরদেশের শাসনকর্ত্তা খেদিবের তত্ত্বাবধানে সুলতানের অধীনে ও ইংরেজদেরই ক্ষমতাধীনে মিশর শাসিত। ইউরোপের এত নিকটে থাকায় ও কতকটা গরম ও বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া

যাবার আসবার পথ সুয়েজ কেনেলের ধারে বলিয়াই ইংরাজ ইহা দখল করিয়া বসিয়াছেন। ভারতবর্ষ জয় করিবার অভিলাষ করিবার সময় নেপোলিয়নেরও এই ইজিপ্ট দখল করিবার ইচ্ছা ছিল। নাইলের যুদ্ধে নেলসনের হাতে সে আশা ভাঙ্গে।

এখন সকল ইংরাজরাজত্বের মধ্যে এইখানেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল তূলা জন্মে বলিয়া ম্যানচেষ্টারএর কতকটা ভরসা। নয় ত তাদের আমেরিকার হাতে সম্পূর্ণরূপেই যেতে হতো। ঋণগ্রস্ত খেদিবএর কাছ হইতে যে সময় ভূতপূর্ব্ব রাজসচিব ডিসরেলি বিলাতের লোকদের না জানাইয়া ও পার্লামেণ্টের পরামর্শ না লইয়াই সুয়েজ কেনেলের সেয়ার কিনিয়া লইয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই ইংরেজের ক্ষমতা এখানে এত বেশী হইয়াছে। পরে আরবী পাশার বিদ্রোহে জেনারেল গর্ডনের প্রাণনাশ; লর্ড কিচেনারের সে বিদ্রোহদমন, ও সুশাসনে মাধির সৈন্য বিধ্বস্ত করার পর হইতে দেশটি এখন কতক সুশৃঙ্খল হইয়াছে। লর্ড ক্রোমারের সুশাসনে সে দেশে এখন এত সুফল ফলিয়াছে বলিয়া সম্প্রতি তিনি রাজভাণ্ডার হইতে প্রভূত পরিমাণে পারিতোষিক পাইয়াছেন। কিন্তু মিশর দেশের লোক অনেকেই অসন্তুষ্ট। "প্যান ইসলামিক দল" বা যে দল মুসলমান রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষায় দেশের জন্য গঠিত হইয়াছে সে দল আজকাল বড়ই বাড়িতেছে।

আমি মিশরের সমস্ত ইতিহাস মোটামুটি সংক্ষেপে বলিয়াছি। যে দেশ পুরাকালে ও অধুনা এত প্রসিদ্ধ সে দেশের পার্শ্ব দিয়া যাইবার কালে তার কথা না বলিলে একান্তই অসম্পূর্ণ হয়। বিশেষ যখন তাদের পুরাকালের সমাজ ও ধর্ম্ম অনেকটা আমাদেরই সমাজ ও ধর্ম্মের মত ছিল। আর যখন ইংরাজের ভারতে আসিবার এক প্রান্তের দ্বারের মত সে পথটি এত আবশ্যকীয়।

শেষে সবিস্তারে বলিব বলিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম, সেটি মিশরেরই পূরা-কালের রাণী ক্লিওপ্যাট্রার কথা! এই রমণীর ইতিবৃত্ত এত প্রাসদ্ধ যে কি ইতিহাস লেখক কি কবি কি চিত্রকর কিম্বা ভাস্কর সকলেই তাঁহার মধুর মূর্ত্তি ও নারীজীবনের অলৌকিক ইতিহাস নানাপ্রকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছে। মার্সেলের "লুই ডি প্যালে" আর্ট গ্যালারীর সামনেই তাঁহারই সর্পবিষে জর্জ্জরিত শিথিল দেহের কাল প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিকৃতি স্থাপিত আছে। কলিকাতার আসিয়াটিক্ সোসাইটির ঘরেও সে চিত্র রক্ষিত আছে। আর ইউরোপে এমন গ্যালারী নাই যেখানে তাঁহার মূর্ত্তি বা সে চিত্র রক্ষিত হয় নাই।

ইনি মিশরের রাজকন্যা। খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীর অবসানের দিনেই ইহার আবির্ভাব হয়। অতি শিশু অবস্থাতেই ইহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। নিজেরই অপর তুইটি ছোট ভাইদের সঙ্গে একত্রে রাণী হইবেন এইরূপ ঠিক ছিল। তখন মিশরে এক অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজবংশে ভাই বোনে বিবাহ হইত। বর্ম্মা দেশেও এইরূপ প্রথা ছিল শুনিয়াছি। নিজ ভ্রাতার সহিতই বিবাহিতা হইয়া দু'জনে সিংহাসনে বসিলেন। সেক্ষপিয়ার বলিয়াছেন,—"Beauty provoketh thieves sooner than gold" —অর্থাৎ সুরূপে যত শত্রু আনে আর সোনাতেও তত আনে না। তাই মিশর রাজ্যে তাঁহার সিংহাসনারোহণে নানা গোলমাল উঠায় তিনি রাজ্য ছাড়িয়া পালান। তখন রোমরাজ্যের প্রধান সেনাপতি জুলিয়স্-সীজর পম্পেকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ধাবন করিয়া কার্থেজে আসিয়াছিলেন। বুদ্ধিমতী রমণী এই সুযোগ দেখিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইলেন। এ রমণীকে যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি আর ভুলেন নাই। এত রূপের মাধুর্য্য ও এত মধুর আলাপের ক্ষমতা ছিল যে যাঁর সহিত একবার সাক্ষাৎ হইত সেই মুগ্ধ হইয়া পড়িত। বীর সীজারও সেইরূপ হইলেন। মিশর রাজ্য জয় করিয়া ক্লিওপ্যাট্রার হাতেই দিলেন ও তাঁর

স্বামীকে হত্যা করিয়া ও অপর ভাইটিকে বিষপ্রয়োগে মারিয়া ফেলিয়া নিষ্কণ্টক হইয়া তাঁহারা দু'জনে একত্রে রোমনগরে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান হয়। পরে যখন রোম রাজ্যের বিবাদ বিসম্বাদে সীজার হত হন, তখন ক্লিওপ্যাট্রাকে মিশরে ফিরিয়া আসিতে হইল। তারপর অনেক গোলমালের পর সীজারের হন্তা ব্রুটাসকে সাহায্য করিয়াছিলেন এইরূপ দোষারোপ করিয়া এণ্টনী ক্লিওপ্যাট্রাকে সাজা দিবেন বলিয়া বিচারালয়ে ডাকিয়া পাঠান। চতুরা রাণী তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। রাণী যাবেন বলিয়া নানারঙ্গে সুরঞ্জিত সুন্দর নৌকাখানি জলে ভাসিল। কাঠের দাঁড়ের পরিবর্ত্তে তার রূপার দাঁড় চলিতে লাগিল। পুরুষ দাঁড়ি দাঁড় টানিবার পরিবর্ত্তে সুরূপা যুবতী রমণীগণ দাঁড় টানিতে লাগিলেন। মধুর সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে নৌকা চলিতে লাগিল। সে জাহাজের পাল মোটা ক্যাম্বিসের নহে লাল পাতলা রেশম দিয়া নির্ম্মিত। মৃদুমন্দ হাওয়ায় নানারূপ সুগন্ধ দ্রব্যের সৌরভ সুদূর অবধি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তারই মাঝে ক্লিওপ্যাট্রা সুসজ্জিতা হইয়া এণ্টনীর কাছে বিচারের জন্য চলিলেন।

সুদূর হইতে আহৃত সুগন্ধ অনুভব করিয়াই এণ্টনী জানিতে পারিয়াছিলেন যে রাণী ক্লিওপ্যাট্রা আসিতেছেন। ক্রমে সঙ্গীতের রবও শুনা গেল ও আরও নিকটে আসিলে সাদা রূপার দাঁড়গুলিও সূর্য্যালোকে সুন্দর প্রতিভাত হইতে লাগিল। পরে যখন চারচোখে এক হয়—তখনকার কথা আর বলিবার কি আছে। চিরকাল ভীষণ যুদ্ধবিগ্রহপ্রিয় ও একান্ত উচ্চাভিলাষী এণ্টনিও এখন হইতে একটি রমণীর ক্রীতদাস হইলেন।

একান্ত মুগ্ধ হইয়া এণ্টনী ক্লিওপ্যাট্রার সহিত নিজ রাজ্য ছাড়িয়া মিশরে গিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অকটেভিয়স্ তাঁহাকে এত দুর্ব্বল দেখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এণ্টনী ও ক্লিওপ্যাট্রা দু'জনের পক্ষেই ছেড়ে



মিশর দেশের মন্দিরে খোদিত প্রতিমূর্ত্তি ও ছবি-আঁকা ভাষা।

থাকা এত অসহ্য হইল যে, সে যুদ্ধে ক্লিওপ্যাট্রাও এণ্টনীর সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধে গেলেন। যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পুর্ব্বেই ক্লিও-প্যাট্রার জাহাজ ভয়ে ত্রস্ত হইয়া পলাইতে লাগিল, এণ্টনীও অনুধাবন করিলেন। যুদ্ধে হার হইলে এণ্টনী নিজে লজ্জায় আত্মহত্যা করিলেন। ক্লিওপ্যাট্রাকে এখন অসহায়া দেখিয়া অকটেভিয়স তাঁহাকে রোমে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু রোমানদের হাতে অবমাননার ভয়ে ভীত হইয়া—ক্লিওপ্যাট্রাও আত্মহত্যা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। সে দেশে একরূপ অতিশয় বিষধর সর্প আছে তাহার বিষে অতি শীঘ্র মৃত্যু হয় অথচ কোনও কষ্ট নাই। এইরূপ সর্পের দ্বারা নিজ হস্তে বুকে দংশিত হইয়া রাণী ক্লিওপ্যাট্রা এ মর্ত্ত্যভূমি ছাড়িলেন।

আশ্চর্য্য যে—সে সব বীরত্বের দিনে আত্মহত্যার কথা সচরাচরই শুনা যাইত। যে কেহ অপমানের ভয় করিতেন তিনিই আত্মহত্যা করিতেন। সীজারের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রুটস ও কেসিয়াস যুদ্ধে হারিয়া এইরূপ করেন। এণ্টনীও তাই করিলেন। রাণী ক্লিওপ্যাট্রাও তাই করিলেন। আর কষ্টহীন উপায়ে সহজে আত্মহত্যা করিবার উপায় জানা থাকিলে কত লোকই যে এইরূপ করিতে আজও প্রস্তুত আছে তার ইয়ত্তা নাই। এই কারণেই আজ-কালকার দিনেও আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে শতকরা বার আনা লোক পুলিশের সম্প্রতিকার তালিকা অনুসারে আফিম খাইয়াই আত্মহত্যা করে।

এইরূপ জীবনের ঘটনাবলীর কথা শুনিয়া সকলেরই ইচ্ছা হয় ক্লিও-প্যাট্রার রূপ ও গুণ বর্ণনার কথা শুনেন। আমিও এ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা মিটাইতে অনেকগুলি পুস্তক পড়িয়াছি। তিনি বড়ই সুগঠন ছিলেন—রং কিন্তু তত উজ্জ্বল ছিল না। আর এত যে আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা ছিল তা তাঁহার মানসিক গুণেরই কারণে। তিনি অতি বুদ্ধিমতী, সুচতুরা ও মধুরভাষিণী ছিলেন। মিষ্ট কথায় মত তো এত আর কোনও

আকর্ষণই নাই। সেই মিষ্ট ভাষা ও মিষ্ট ব্যবহারের গুণেই তিনি এমন দিগ্বিজয়িনী ছিলেন!

রোমের যত বীর কুল সীজার এণ্টনী অকটেভিয়স সকলেই তাঁর রূপে গুণে মুগ্ধ ছিলেন। এণ্টনীর যে তাঁহাকে দেখিয়া অবধি চরিত্রের কি দারুণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল—তাহা Shakespearএরই একটি কথা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে—

Cleo. "If it be love indeed
Tell me how much"

Ant. "There is beggary in the love
That can be reckoned."

Cleo. "I would fain know
How far it is to be beloved."

Ant. "Then you must find
New Heaven, New Earth."

ক্লিওপ্যাট্রা জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি যদি যথার্থই ভালবাস, তো আমাকে বুঝাইয়া দাও কতটা ভালবাস।"

এণ্টনী বলিলেন "যে ভালবাসা বলে বুঝান যায়, সে ভালবাসা অতি সামান্য।"

নারীসুলভ অনুসন্ধিৎসা বশতঃ রাণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তবুও আমি জানতে চাই কতটা ভালবাসার পাত্র হওয়া যাইতে পারে।"

এণ্টনী তার উত্তরে বলিলেন,—

"তা হলে তুমি আর একটি পৃথিবী ও আর একটি আকাশ খুঁজিয়া বার কর, কারণ আমার ভালবাসা তো একটিতে কুলাবে না।"

এখন সেই এণ্টনী রোম নগরের নাম শুনিলে বলিয়া উঠিতেন—"Grates me" অর্থাৎ ও কথা আমার কাণে বড়ই কর্কশ লাগে। রাণী ক্ষণে ক্ষণে কত রকমেই ভাব পরিবর্ত্তন করিতেন। কখনও সরস মধুর ভাব, কখনও বা রুদ্রমূর্ত্তি; কার্য্যসাধনে সর্ব্বদা ঠিক সময়ে ঠিক ভাবই আসিত।

রাণী যখন এণ্টনীর সহিত প্রথম সাক্ষাতে বিচারে জয়লাভ করিয়া দেশে ফিরিতে চাহিলেন, বিচারপতিকেও সঙ্গে লইবার জন্য বীরাঙ্গনা কাব্যের নিম্নোক্ত ভাবেই মধুর সম্ভাষণ করিয়াছিলেন—

"কায়মনপ্রাণ আমি সঁপিব তোমারে
ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে।"

আবার রোমরাজ্য হতে কোন লোক এণ্টনীর সঙ্গে দেখা করতে আসবে ইহা তাঁর একান্ত ইচ্ছা নয়। সেই নিমিত্ত সেখান হইতে কোনও দূত আসিলেই এণ্টনীকে গঞ্জনা দিয়া বলিতেন—

"ওই বুঝি তোমার স্ত্রী ঝগড়াপ্রিয়া "ফুলভিয়া" (Fulvia) তোমাকে ফিরায়ে নিয়ে যাবার জন্য রোম থেকে লোক পাঠাইয়াছেন।"

এরূপে সরল ও দৃঢ়ভাবে এণ্টনীর আকর্ষণ আরও দৃঢ়তর হইত।

ক্লিওপ্যাট্রার অপ্রিয় জানিয়া তিনিও স্বদেশী লোক দেখিলে জ্বলিয়া উঠিতেন। রোম হইতে কোনও দূত যদি রোমের দুরবস্থার কথা এণ্টনীকে বলিতে আসিত তিনি অমনি বিরক্ত হইয়া বলিতেন—"এ কথা এখন দারুণ অপ্রিয় লাগে। রোমনগর টাইবার নদীর অতল জলে ডুবিয়া যাক তাতেও আমার এতটুকু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।"

"Let Rome in Tiber melt."

ভূমধ্যস্থ সাগর।

যখন মিশরের সীমা-রেখা শেষ দৃষ্টিপথ হইতে চলিয়া গেল, তখন সন্ধ্যাও আসিয়াছিল। আকাশে আলোক থাকিতে থাকিতেই দূরে সে রেখা মিলাইয়া গেল। এইবার কেবল অনন্ত আকাশ ও চারিদিকের অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখিবার নাই।

আমার সর্ব্বাপেক্ষা দেখিতে ভাল লাগে—সান্ধ্য-গগন ও উষা। আর যখন রাত্রি ধরণীর দৃশ্যগুলিকে ঢ'কিয়া দিয়া উপরের অনন্তপথ খুলিয়া দেখায় তখন একা একান্তে বসিয়া সেই দিকে চাহিয়া যা'তা' ভাবা আমার চিরদিনেরই অভ্যাস আছে, জাহাজেও তাই করিতাম।

আজ আমার বার বার কেবলই এই ভূমধ্যস্থসাগর ও তার আস-পাশের সব প্রসিদ্ধ স্থানেরই কথা মনে আসিতে লাগিল। এই স্থানটি পুরাকালিক কত ঘটনাবলীতে প্রসিদ্ধ। পুরাতন জগতের ইহাই কেন্দ্রস্থান বলিয়া বিবেচিত হইত। যত বাণিজ্য ব্যবসা তখন এই খানেই চলিত। এখন সে কেন্দ্র পরিবর্ত্তিত হইয়া ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী "আটল্যাণ্টিক" মহাসাগরে আসিয়াছে। যত পুরাকালের সভ্যতাও এই ভূমধ্যস্থসাগরেরই চারিদিকে বিকশিত ছিল। এই সমুদ্রটিই এককালে গ্রীস রোম এবং অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী দেশের লীলাভূমি ছিল। আধুনিক পুরাতত্ত্বের মতে মিশর হইতেই গ্রীসে প্রথম সভ্যতা আসে। পরে ফিনিসিয় দেশ হইতে "কেডমস্" নামক এক রাজা আসিয়াই গ্রীসে অনেক নূতন কথা শিখান। মিশর হইতে আনিয়া আঙ্গুরের চাষ ও লেখার প্রবর্ত্তন প্রথমে তিনিই এখানে করেন। এইরূপে বিভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া একে একে কতকগুলি উপনিবেশ এ স্থানে স্থাপিত হইল। প্রথমে তাহারা পরস্পরের সহিত কতই কলহ করিত। যুদ্ধ বিগ্রহ বই আর কিছুই ছিল না। ক্রমে যত জ্ঞান ও সভ্যতা বৃদ্ধি পাইতে

লাগিল, সকলেই বুঝিলেন যে, একতা কত সুবিধার জিনিষ। এই জ্ঞান লাভ করিয়াই অনেকগুলি গ্রীক উপনিবেশ প্রতিনিধি পাঠাইয়া বৎসরে একবার একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরের ভাল মন্দ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেন। একেই বলে "Amphictyonic Council" বা জ্ঞানী লোকের সভা, এই সামান্য সভা হইতেই পরে এথেন্সের স্বাধীন তন্ত্রের উৎপত্তি। সকল দেশেই এইরূপ হইয়া থাকে। একত্র বাস করিতে গেলেই পরস্পরের স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। একত্র পরামর্শ করিয়াই রাজ্যের হিতাহিত স্থির করা হয়। আমাদের দেশের পঞ্চায়ত-সভা ও বিলাতের পার্লামেণ্ট সভা অবধি এইরূপেই উৎপন্ন। একতাতে সকল বিষয়েই সুবিধা হয়, একতাই সকল জাতীয় শক্তির মূল। এই সময়ে দেশের এমন ক্ষমতা ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া—সে দেশের আদিমবাসী ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানের লোকেরাও গ্রীকদের সহিত সমান স্বত্ব দাওয়া করাতে, প্রথমে গ্রীস তাহা দেয় নাই। অনেক দাবীদাওয়া ও গোলমালের পর এই "হেলটরা" সে স্বত্ব পায়। এরূপ ইতিহাস সকল দেশেই সমান। স্বত্ব কখনই অমনি মিলে না।

অনেকগুলি উৎসব ও অন্যান্য প্রথা লইয়াই গ্রীসে এই একতা-বন্ধন এত দৃঢ় হইয়া আসিয়াছিল। তার মধ্যে একটি তাদের Olympic Game, অর্থাৎ অলিম্পিয়া পাহাড়ে বাৎসরিক উৎসবের আড়াআড়ি খেলা। তাহাতে ব্যায়াম ও কলাবিদ্যার পরীক্ষা হইত। বৎসরের মধ্যে একবার গ্রীসের সকল রাজ্য হইতে লোক আসিয়া একত্র মিলিত হইয়া নানারূপ ব্যায়াম ও ক্রীড়া করিত। কে কত শীঘ্র দৌড়াতে পারে, কত দূর লাফাইতে পারে, কত বেগে ঘোড়া চড়িয়া যাইতে পারে, বা তীর ছুড়িতে পারে ইত্যাদি লইয়া পরস্পরে আড়া-আড়ি হইত। এইরূপ সকল বিষয়েই খেলা ছিল। বর্শা লইয়া, তলওয়ার লইয়া, গদা লইয়া এই খেলা হইত,—এই খেলা দর্শকবৃন্দকে

কতই আনন্দ দিত। উৎসবের কয়দিন লোকে লোকারণ্য। আর যিনি যে যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইতেন, তাঁহার পারিতোষিক কি—সোণা নয়, রূপা নয় একটি "অলিভ" পাতার মুকুট। সেরূপ সম্মান আর কেহ কোথাও পায় না—মধ্যযুগের Tournament যুদ্ধ খেলাও এইরূপ খেলা তাতে জেতার পুরস্কার,—একটি রমণীর স্নেহদৃষ্টি ও সম্মান। অধুনা সোণা রূপার "কাপ" উপহার দেওয়া প্রথা হইয়াছে। কিন্তু গ্রীসে স্নধুই অলিভ পাতা। স্পার্টার আইনকর্ত্তা লাইকারগসের কঠোর নিয়মানুসারে স্পার্টার শ্রেষ্ঠ উপাদেয় খাদ্য ছিল Black broth, সে একরূপ তরকারীর ডাল্না মাত্র। এই সামান্য উপলক্ষ করিয়াই তখন তাঁহারা কত বড় হইতে পারিয়াছিলেন।

এই গেল একতা বন্ধনের একটি উপলক্ষ। আর একটি উপলক্ষ Delphic oracle "ডেলফি" মন্দিরের ভাগ্যগণনা। সে স্থান একটি ভাগ্য-গণনার স্থান মাত্র; তীর্থযাত্রার মত সবাই সে স্থানে যাইয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিতেন। একটি ছোট বালিকাকে একটি বেদীতে বসাইয়া তাঁহার চারিদিকে ধুপ ধুনার ধোঁয়া দেওয়া হইত। ক্ষণেক পরেই বালিকাটি অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। তখন তাঁহাকে যা জিজ্ঞাসা করা হইত, তার তিনি যথাযথ উত্তর দিতেন। সে ভবিষ্যৎ বাণী অধিকাংশ সময়েই না কি ঠিক হইত।

পূর্ব্বোক্ত লাইকারগসের কঠোর নিয়ম পালন করিয়া অল্প দিনেই স্পার্টা অতিশয় প্রতাপান্বিত হওয়ায় যখন এথেন্স ও স্পার্টার যুদ্ধ বাধে—তখন এথিনিয়নরা ভীত হইয়া এই স্থানে পরামর্শ লইতে যাইলেন। ভবিষ্যৎ বাণী হলো—"তোমরা তিন চোখোকে সৈন্যাধ্যক্ষ কর, যুদ্ধে জয় হইবে।" তিন চোখো কে তা ঠিক করিতে না পারিয়া তাঁহারা এক চোক কাণা এক গুরু মশাইকে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে দেখিয়া ঠিক করিলেন, যে ইনিই "তিন চোখো"। তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া

তাহায় কবিতা রচনা করিয়া সৈন্যদের উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাতে তাহারা মাতিয়া উঠিয়া এমন সাহস ও নিপুণতার সহিত যুদ্ধ করিল যে, তাদেরই জয় হইল।

ফরাসী দেশেও এইরূপ এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। বহুদিন পূর্ব্বে যখন ইংলণ্ড প্রায় ফরাসী দেশের সকল অংশ জয় করিয়াছিলেন, তখন অনন্যোপায় দেখিয়া ফরাসীদেশের সকল লোক হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে এক অষ্টাদশবর্ষীয়া কৃষক-কন্যা তাহার বাসভূমি লোরেনে এই বার্ত্তা শুনিয়া সর্ব্বদা প্রান্তরে একা মেষ চরাইতে চরাইতে মনে করিতেন যে, কে যেন আকাশপথ হইতে তাঁহাকে বলিতেছে,— "তুমিই তোমার জন্মভূমি রক্ষা করিতে পারিবে।" বালিকা বর্ম্ম পরিয়া নিজ দেশের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও তাঁহার সৈন্যের নেতা হইয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তাঁহার কথায় এত উৎসাহিত হইল যে, তাহারা এখন যেখানে যায় সেখানে জিতে। ক্রমে সকল স্থানে কৃতকার্য্য হইয়া শেষ যুদ্ধে সেই অমানুষিক বালিকা শত্রুদের হাতে ধরা পড়েন। তাহারা তখন তাঁহাকে ডাইনী বলিয়া পুড়াইয়া মারে। তবে তিনি যে কার্য্যের জন্য অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, সে কার্য্য সমাধা করিয়া গেলেন,— ফরাসী দেশ স্বাধীন হইল।

গ্রীসদেশে পূর্ব্বোক্ত এই দুটি উপায়েই দিন দিন জাতীয়তা বন্ধন বাড়িতে লাগিল। তখন এক হইয়া গ্রীসের প্রতাপ দেখে কে? এই সময়ে পার্শিয়ার সম্রাট "ডোরায়স্" মহা প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। তিনি অসংখ্য সৈন্য লইয়া সমুদ্র পার হইয়া গ্রীস আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এমন একতাবন্ধনে বলীয়ান জাতিকে কেমন করিয়া জয় করিবেন, তিনি পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া বিতাড়িত হইলেন। তার কিছু বৎসর পরে তাঁরই পুত্র জেরেকসিস্ আরও বিপুল আয়োজন করিয়া পুনরায় গ্রীসের বিরুদ্ধে

সৈন্যাধ্যক্ষ লিউনিডস্ কেবলমাত্র ২০০ জন সৈন্য লইয়া এক পর্ব্বতের পাশে ৫০০০০ সৈন্যের পথ আগলাইলেন। এমন যুদ্ধ কেহ কখন দেখে নাই। সেই ২০০ সৈন্যে ৫০০০০ সৈন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া একটিও দেশে ফিরেন নাই।

একতায় গ্রীসের এমন ক্ষমতা বৃদ্ধি; তারপরে অতি বৃদ্ধিতে প্রায়ই যাহা ঘটিয়া থাকে, তাই ঘটিতে লাগিল। দুই ক্ষমতাশালী দেশ এথেন্স ও স্পার্টাতে মহা রেষারেষী আরম্ভ হইল। এইরূপে পরস্পরে ঘরাও যুদ্ধ করিয়া গ্রীক জাতির কত শক্তি ক্ষয় হইতে লাগিল। আর সে একতা বন্ধন নাই। তারপরই আবার থীব্‌স্‌এর সঙ্গেও বিবাদ বাধিল; সেও অন্যতম একটি গ্রীসের রাজ্য। যখন ক্রমে ক্রমে এইরূপ ঘরাও বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিয়া উঠিল, তখন আর বাহিরের শত্রুর কি ভয়? মেসিদন রাজ্য গ্রীসেরই উত্তরে—এখন এই রাজ্যই তুর্কির রাজ্য হইয়াছে। সেখানকার রাজা ফিলিপ আসিয়া অনায়াসে গ্রীস জয় করিয়া ফেলিলেন। ইঁহারই পুত্র জগৎ বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দর। তিনি ভারতবর্ষেও জয়পতাকা আনিয়াছিলেন।

গ্রীসের এইরূপ ঘরাও বিবাদ ও অধঃপতন হইবার কালে "ডিমস্থিনিস" নামক এক এথিনিয়ন ওজস্বিনী বক্তৃতায় নিজ দেশের লোকদের চেতনা জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহারা তখন কতই ভোগবিলাসী ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই তাঁর এত চেষ্টাতেও নিয়তিকে বারণ করা গেল না। এই বাগ্মিবরের জীবনীও অতিশয় বিস্ময়কর কথা। চেষ্টায় যে সকল বাধা ও বিপত্তি অতিক্রম করা যায়, তাহারই একটি ভাল উদাহরণ। তিনি বড় তোতলা ছিলেন—সেই দুরারোগ্য দোষটি অতিক্রম করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রত্যহ সমুদ্রতীরে গিয়া মুখে পাথর দিয়া পরিষ্কার কথা কহিবার অহরহঃ চেষ্টায় শেষে কৃতকার্য্য

যে, যে শুনিত সেই পাগল হইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ছুটিত।

ইহার কিছু দিন পূর্ব্বেই এই দেশে বিজ্ঞবর Socratesএর জন্ম হয়। তিনিও নিজ দেশের দুরবস্থা দেখিয়া নানা উপায়ে তাহাদের শিখাতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখনকার লোকে—বড়ই বিবাদপ্রিয় হইয়াছিল আর সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক কুপ্রথায় দেশের লোকের শক্তি একেবারে জর্জ্জরিত হইয়াছিল। তিনি তাদের সৎশিক্ষা দিবার জন্য—অল্পবয়স্ক বালকেরাই নূতন উপদেশ শিক্ষা করিবার বিশেষ উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাদেরই এই সকল উপদেশ দিতেন। তাতে তাঁহার শত্রুরা ছেলেদের কুশিক্ষা দিয়া বিগড়াইয়া দিতেছেন এই অভিযোগে তাঁহাকে দণ্ডিত করিল। হেমলক লতার রস পান করিলে শরীর ক্রমে ক্রমে অবশ হইয়া মৃত্যু ঘটে। রাজদণ্ড অনুসারে এই রস পান করিয়াই সক্রেটিসের মৃত্যু হয়। তিনি কখনও পলাইবেন না জানিয়া খোলা কারাগারেই তাঁহাকে রাখা হইয়াছিল, মনে করিলেই তিনি পলাইতে পারিতেন—অনেকে সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়াও সক্রেটিসের অপ্রীতিকর হইয়াছিলেন। শেষ সময়ে—তিনি প্রভূত ছাত্রবৃন্দ দ্বারা পরিবৃত হইয়া সেই বিষ পান করিতে করিতে আত্মার অবিনশ্বরতার কথা বলিতে ও তাহাদিগকে সদুপদেশ দিতে লাগিলেন। ছেলে কোলে করিয়া তাঁর স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, তিনিও কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন। ক্রমে বিজ্ঞবরের দেহ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। বহুকাল নির্ব্বাক ও নিশ্চেষ্ট থাকিয়া সেই মহাপুরুষ ধরাধাম পরিত্যাগ করিলেন।

আমি যখন মেডিকেল কলেজে প্রথম ভর্ত্তি হই—ক্লাসে কোনেয়ম বা হেম্‌লকের কথা শুনিয়া আমার চোখে জল আর থাকে নাই। এখনও সে মহাপুরুষের কথা অহরহঃ আমার মনে হয়। এমন জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী ও

গ্রীসের তারপরের ইতিহাস অতি শোচনীয়। ক্রমে রোম আসিয়া গ্রীস জয় করিল; ক্রমে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে মুরযুদ্ধে সমগ্র গ্রীস তুর্কির পদানত হইয়া পড়িল। তারপর আবার সে দিন মাত্র স্বাধীনতা অপর জাতির সাহায্যে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া এখনও গ্রীস কোনরূপে দাঁড়াইয়া আছে মাত্র।

এই গেল সংক্ষেপে গ্রীসদেশের ইতিবৃত্ত। ইহা বলিবার মানে আর কিছুই নয়, কেবল বোঝানো যে,—সে রাজ্য যাহার ইতিহাসের কথা এখন সংক্ষেপে বলিব তাহার সঙ্গে এ সকল দেশের ইতিহাসে কত মিলে। শুধু রোমের সঙ্গে কেন—ইংলণ্ডের ইতিহাসের ও আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গেও তার অনেক মিল আছে। মোটামুটী ধরিতে গেলে সকল দেশের ইতিহাসই সমান। তার মধ্যে এই কয়টি কথা বিশেষ করিয়া বলিবার আছে।

আদিমবাসীর সহিত নবাগত সভ্যজাতির সর্ব্বত্রেই চিরবিবাদ। ভারত-বর্ষে বিষম জাতিভেদ সূত্রে তারা আলাহিদা একশ্রেণী হইয়াই চিরকাল রহিয়া গেল। কিন্তু অন্যান্য দেশে তাহারা বহু রক্তপাতের পর মিলিয়া এক হইয়াছে। এইরূপে অনেক শ্রেণীর একত্র মিলনের পর হইতেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। ক্রমে উচ্চপদে চড়িলে সচেষ্টভাব অনেক কমিয়া যায় ও দম্ভ আপনিই আসিয়া পড়ে। এই দম্ভই পতনের মূল। ঘরে ঘরে বিবাদ সেই দম্ভ হইতেই উৎপন্ন হয়। তাতেই দেশটি শেষে ছারখারে গিয়া নূতন জাতির পদানত হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে সকলগুলি হইয়াছে কেবল গোড়ার মিলটি হয় নাই, তাই আমাদের পতন আরও এত অতল ও এত দুর্নিবার্য্য।

আর একটি উদাহরণের মত এইবার রোমের কথাও বলিতেছি। সে রাজ্যের উত্থান আবার গ্রীসের কতকগুলি লোক যাওয়াতেই ঘটিল।

করিল। তাদের পার্শ্বস্থিত ইট্রাস্কান্ প্রভৃতি লোকেরাও সমান স্বত্ব দাবী করায় সাধারণ লোক বা "প্লীবিয়ন" ও বড়লোক বা "পেট্রিসিয়নদের" মধ্যে কত রক্তপাত হয়। জল যেমন সমতল খোঁজে, সকল শ্রেণীও একত্র থাকিলে তেমনই সাম্যভাব স্থাপিত হয়,—সে প্রকৃতির চেষ্টা অনিবার্য্য। ক্রমে নীচ শ্রেণীর লোকদের স্বত্ব-স্বামিত্ব দেখিবার জন্য রোমে Tribune নামক কর্ম্মচারী নিরূপিত হইল। ক্রমে সবাই সমান হইয়া রাজ্যের অসীম ক্ষমতা বাড়িল। এককালে সমস্ত ইউরোপ তাহাদের পদতলে ছিল। পরে দম্ভ, পাপপ্রবেশ, জাতিভেদ ও পতন। মহা মহা দেশের ভাগ্যচক্রের এই পরিবর্ত্তনগুলি সকল লোকেরই জানা উচিত।

আর একটি বিশেষ জানিবার বিষয়—ক্ষমতার যুগে যুগে স্থান পরিবর্ত্তন। আর্য্যজাতি মধ্য এসিয়াতেই ছিলেন—সে স্থান হইতে দলে দলে তাঁহারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলেন। নিজেদের কথা বলিয়া কাজ নাই। কিন্তু এসিয়া এককালে অতি সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। এসিয়া মাইনরে "সিরিয়া" প্রভৃতি রাজ্যও কত প্রতাপশালী ছিল। মিশর কত পুরাতন। ক্রমে মিশর হইতে গ্রীসে, গ্রীস হইতে রোমে, ও রোম হইতে সমগ্র ইউরোপের স্পেন ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সভ্যতা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বদেশে অবস্থিত এসিয়া ও আফরিকা হইতে উৎপন্ন সে স্রোত ক্রমে ক্রমে যেন ঠিক পা ফেলিয়াই—ইউরোপের পশ্চিম দিকে গিয়াছে—এখন সেখানেই তার কেন্দ্রস্থান; আবার সেখান হইতেও ক্রমশঃ পশ্চিমে সরিয়া গিয়া আমেরিকাতে তাহার পিঠস্থান করিয়াছে। আবার প্রশান্ত সমুদ্র পার হইয়া এসিয়ারই একপ্রান্তে সুদূর জাপানে উদয়। তার পরও কি মনে হয় না যে সেই সূর্য্য আবর্ত্তনের পূর্ব্ব পথে চলিয়াই আবার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিবেন? সেই দিন নিশ্চয়ই আমাদের দেশে আনা যায়,—সেইরূপ যদি সকল জাতি সকল ধর্ম্মের লোক আবার একত্র মিলে।

ভূমধ্যস্থ সাগর।

ভূমধ্যস্থ সাগরের আশ পাশের স্থানগুলির অনেক ইতিহাস বলিয়াছি। কি পুরাকালের হিসাবে, কি আধুনিক হিসাবে, এ স্থানটি এত প্রসিদ্ধ যে, উহাদের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জানা বড়ই আবশ্যকীয়। পুরাকালে সভ্য জগতের ইহাই কেন্দ্রস্থান ছিল। ইহারই নিকটবর্ত্তী স্থানে সভ্যতার বিকাশ ও প্রচার হয়। বাণিজ্য হিসাবেও এই স্থানটি তখন সর্ব্বপ্রধান ছিল। মিশর, ফিনিসিয়, গ্রীক ও রোমান জাতিরা এই খানেই বাণিজ্য করিতেন। এই স্থানটিই আসিয়া ও ইউরোপের সন্ধি স্থান। ইহারই পূর্ব্বদিকে অবস্থিত মরুময় আরব দেশের পুণ্য ভূমিতেই পৃথিবীর দুইটি ধর্ম্মের স্থাপনা হয়। আর কোনও কোনও প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের বিশ্বাস যে, এই পথ দিয়াই মধ্য আসিয়া হইতে আর্য্যজাতি ইউরোপ ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ছড়াইয়া পড়েন, ও সভ্যতার আদি বিকাশ আসিয়াভূমেই হইয়া দেশে দেশে প্রচারিত হয়। কিন্তু এখন ইউরোপ প্রভৃতি স্থানই ক্ষমতা ও সভ্যতার পিঠস্থান হইয়াছে, এবং আমেরিকার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আটলাণ্টিক মহাসাগরই বাণিজ্যের প্রধান স্থান হইয়াছে। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সময়ে সকল জিনিষই স্থান পরিবর্ত্তন করে। একস্থানে অনেক দিন থাকিলে কোনও জিনিষেই জীবনী-শক্তি স্ফূর্ত্তি পায় না। তাই দোপাটি গাছের ফল সজোরে ফাটিয়া চারিদিকে বীচি ছড়াইয়া দেয়; তুলার হালকা ফলগুলি হাওয়াতে উড়িয়া গিয়া সুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়; ও আম কাঁঠাল প্রভৃতি সুমিষ্ট ফলগুলি প্রাণিগণের দ্বারা সাদরে ভুক্ত ও দূরে নীত হওয়াতেই এই সকল গাছের বংশ বৃদ্ধি হয় ও শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। 'বহু শতাব্দী

হইতে এই এক স্থানে এক ভাবে থাকিয়া সমুদ্রযাত্রায় নিষিদ্ধ হইয়া আমাদেরও অধঃপতন এই কারণেই ঘটিয়াছে।

সকলেই জানেন, ভূমধ্যস্থ সাগরটি প্রায় চারিদিকে জমি দিয়ে ঘেরা। ইহার উত্তরে ইউরোপ, দক্ষিণে আমেরিকা ও পূর্ব্বে আসিয়াভূমি বিদ্যমান। কেবল পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগরের সহিত যোগ হইবার একটি অপ্রশস্ত প্রণালী আছে। জিব্রাল্টার নামক এই প্রণালীটি চারি পাঁচ মাইল মাত্র প্রশস্ত। এই প্রবেশস্থান আগুলিয়া একটি উঁচু পাহাড়ের উপর জিব্রাল্টারে ইংরাজের সুরক্ষিত দুর্গ বিরাজমান আছে। সেই কারণে এই স্থানে পূর্ব্বাঞ্চলে ব্যবসা করিবার পথ বলিয়া, ইংরাজের ক্ষমতাই প্রধান। তার প্রবেশের পথে জিব্রাল্টার, আধপথে মাল্টা দ্বীপ, তারপর মিশর ও এক কোণে সাইপ্রাস্ দ্বীপ ইংরাজেরই অধিকৃত।

এই স্থানে অতি সুমিষ্ট ফল পাওয়া যায়; এমন সুমিষ্ট, নরম ও রসাল কমলা লেবু কোথাও দেখি নাই। তার বীচি নাই; তার ছিব্‌ড়ে নাই। তার খোসা এত পাতলা যে ছাড়ান যায় না। আর মুখে দিলে সুগন্ধযুক্ত মধুর রস রসনায় স্রোত বহিয়া যায়। আঙ্গুর ও আপেল প্রভৃতি ফল হইতে নানারূপ সুগন্ধ মদিরাও এই স্থানের একটি চিরপ্রসিদ্ধ উৎপন্ন দ্রব্য।

কিন্তু এ সমুদ্রটি বড়ই অনিশ্চিত ও অস্থির। অতি অল্পক্ষণেই সমুদ্রের অবস্থা পরিবর্ত্তন ঘটে। তার কারণ আর কিছুই নহে—কেবল ঢেউগুলি চারিদিকের জমিতে প্রতিহত হইয়া বার বার ফিরিয়া আসে। সায়েদ বন্দর হইতে একদিন যাইয়া সন্ধ্যার পরই সমুদ্র অস্থির হইয়া উঠিল। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে তরঙ্গগুলি প্রবলতর হইয়া জাহাজকে বিষম আলোড়িত করিতে লাগিল। সমুদ্রে উঁচু উঁচু ফেনাময় ঢেউ ও অতি প্রবল বাতাস ও আকাশে কাল কাল মেঘ একত্রে দেখিলে, অপার অনন্ত সমুদ্রের মাঝে জাহাজটিকে কতই অসহায় মনে হয়। একটি

সামান্য বুদ্বুদের মত এক নিমিষে অনন্ত জলে তাহা বিলীন হইতে পারে। ক্রমে জাহাজ এত বেশী দুলিতে লাগিল যে, আর ডেকে থাকা অসম্ভব।

প্রথমেই স্ত্রীলোকেরা বমি করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদের মতনই স্বভাববিশিষ্ট। একেবারে শুইয়া অতি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া নিদ্রাবিরহিত হইয়া দুই দিন কাটাইয়াছিলাম। সে অবস্থা বড়ই কষ্টকর। পা টলে, মাথা ঘুরে, গা বমি বমি করে, আর উঠে অতি কম; কেবলই বমির বেগ মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য, সমুদ্র প্রশান্ত হইলেই, অতি অল্পক্ষণেই সকল বে-ভাব চলিয়া যায়। ঘুরপাক দিলে যে জন্য গা ঘুরে, এও সেই কারণেই উৎপন্ন হয়। মানববুদ্ধির কাছে ত কোনও বাধা-বিপত্তিই বহুকাল দাঁড়াইতে পারে না, তাই এখন বিজ্ঞানের সাহায্যে এমন একরূপ ঝোলান বিছানা আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাতে চড়িয়া থাকিলে আর সমুদ্রপীড়া হয় না।

আমি যে সব চীন জাহাজে গিয়াছি, সে সব জাহাজের বন্দোবস্ত হইতে বিলাতী জাহাজের বন্দোবস্ত আরও ভাল। শুনেছি নাকি, আমেরিকার জর্ম্মণ-হামবার্গ লাইনের জাহাজগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও সুবিধাজনক। জাহাজে থাকিবার কালে বাড়ীতে থাকার সকল সুখ সম্ভোগ করিতে পারা যায়। ঘণ্টা বাজাইলেই কলের মত ভৃত্য আসিয়া আজ্ঞা পালন করে। আহার্য্য সামগ্রী এত বেশী যে, খাওয়া যায় না। নানারূপ উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য প্রতি বন্দর হইতেই লওয়া হয়। কিন্তু সেগুলি ভালরূপে রাঁধা হয় না। এত লোকের একত্র রন্ধন বড় সোজা কাজ নয়। আর তা ছাড়া মাংস, ডিম, দুগ্ধ ইত্যাদি অনেক জিনিষই কৌটায় করিয়া ও বরফের ঘরে অনেক দিন ধরিয়া রক্ষিত থাকে বলিয়া, তার স্বাদ কিছু কমিয়া যায়। যাহাই হউক, এইরূপে খাদ্যদ্রব্য বহুদিন ধরিয়া রাখিবার

জিনিষ প্রচুর জন্মায় সেই দেশ হইতে সেই সকল দ্রব্য এইরূপ প্রকারে রক্ষিত হইয়া দেশ দেশান্তরে নীত হইতেছে। এ এক বড়ই লাভজনক ব্যবসা। আমেরিকা হইতে এইরূপে অনেক মাংস রপ্তানি হয়—অষ্ট্রেলিয়া হইতেও এইরূপ মাংস ও দুধ আসে। যুদ্ধক্ষেত্রে ও জাহাজেই এই সকল বেশী ব্যবহৃত হয়। শস্যের ত কথাই নাই; তাহা আরও সহজে বহুদিন রাখা যায়। সে শস্যের ভিতরকার খাদ্যগুলি শস্য-ভ্রূণের জন্যই রক্ষিত। আর এমন সুব্যবস্থায় প্রকৃতিদেবী সে ভাণ্ডার সুন্দররূপে আবৃত করিয়া রক্ষা করিয়াছেন যে, বহু বৎসর ধরিয়াও তাহা নষ্ট হয় না। শত সহস্র বৎসর পরেও শস্য হইতে গাছ জন্মাইতে দেখা যায়।

দুই দিন বিছানায় পড়িয়া থাকিবার পরদিন ভোরে সমুদ্র স্থির হইল। তখন সুদূরে পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত করিয়া সবে মাত্র আলো ফুটিতেছে। তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া ডেকের উপর গিয়া দেখি, নিকটেই ইতালীর সবুজ গাছপালা বিশিষ্ট জমি দেখা যাইতেছে। অল্পক্ষণ পরেই সিসিলী দ্বীপ দৃষ্টিপথে আসিল। সে দ্বীপটি পাথরবিশিষ্ট পাহাড়ে ভরা ও অনেক গাছপালাও আছে। "মেসিনা" প্রণালীর ভিতর দিয়া আমাদের জাহাজ চলিতে লাগিল। ইতালী ও সিসিলীর মধ্যে এই প্রণালীটি আছে। দুই ধারের জমিই অতি নিকট দেখা যায়। দু-ধারেই বসতিতে পরিপূর্ণ পাহাড়ের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে সুন্দর সুন্দর রং করা পাথরের বাড়ী। চারিদিকে বাগান ও ঘন সবুজ গাছ। এমন কি দূর হইতে ফুল গাছও দেখা যাইতে লাগিল। সমুদ্রের ধারে ধারে ধোঁয়া উড়াইয়া রেলগাড়ী চলিতেছে। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় আলোকস্তম্ভ ও ধ্বজা পতাকা। একটী গাছপালাহীন চূড়ায় কামানের ঘুলঘুলিবিশিষ্ট কেল্লা প্রখরদৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া আছে। ধারে ধারে অনেকগুলি নৌকা ও জাহাজ। ইটালীর মাঝিরা সব

নৌকাও প্রণালীর মধ্য দিয়া এ পার ও পার ফেরি করিতেছে। জাহাজের বাঁশীস্বরে দুইধারের পাহাড় প্রতিধ্বনিত হয়, বেশ শুনা যায়। ওই প্রসিদ্ধ সহরটি "মেসিনা।" সমুদ্রের ধারে উন্নত স্থানে সবুজ জায়গায় ওই স্থানটি কত স্বাস্থ্যকর, কি সুন্দর স্থান! আমাদের দেশের ক্লান্ত-রুগ্ন লোকেরা কিছুদিন এই মত স্থানে থাকিলে কত সুস্থ হন।

ইহার অনতিদূরেই ঠিক জলের মধ্য হইতে মাঝ সমুদ্রে একটি আগ্নেয়গিরি উঠিয়াছে। তাহার দৃশ্য কি ভীষণ! আমরা যখন দেখিলাম তখনও তাহার উপর হইতে অগ্নি নিক্ষিপ্ত হইতেছে ও ধোঁয়া বাহির হইতেছে। সে গিরির উপর একটীও গাছপালা নাই, তার ধারে ধারে গলা পাথর পড়িবার দাগ। অগ্নি উৎপাতের সময় ওই গুলি দিয়া গলা ধাতু দ্রব্য গড়াইয়া পড়ে। এই পাহাড়টিকেই "ষ্ট্রম্বলী" বলে। এ স্থানের কি মহতী কি ভীষণা মূর্ত্তি!

এই ইটালীদেশে মহা জ্যোতিষী গেলিলিওর জন্ম হয়। পৃথিবীই সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, এই নূতন কথা বলাতে পুরাতন মতাবলম্বী তাঁহার দেশের লোক তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কত নিগৃহীত করিয়াছেন। আর এই সিসিলির দ্বীপেই পদার্থবিদ্যাবিৎ আরকিমিডিসের জন্ম হয়। তিনি নানারূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর দ্বারা আপনার মাতৃভুমি ছোট দ্বীপটিকে কত শক্রর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। বড় বড় আরমার সাহায্যে সূর্য্যের রশ্মি ঘনীভূত করিয়া শক্রর জাহাজ দূর হইতে দগ্ধ করিতেন। জ্ঞানচর্চ্চায় এতই মনোনিবেশ যে যখন শক্র ঘরে অজানিত হইয়া প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হনন করিতে উদ্যত তখনও তিনি জীবন ভিক্ষা না করিয়া বলিলেন "অপেক্ষা কর, এই তত্ত্বটির মীমাংসা করি, ক্ষণেক পরে মারিও।"

এই স্থান হইতে কিছুদিনের পথে "কর্সিকা দ্বীপ।" যাইতে যাইতে

সে দেশও তখন আমাদের দেশেরই মত ফরাসী দেশের পদানত ছিল। পরাধীন দেশের এই বালকই পরে ভুবন বিজয়ী হইয়াছিলেন। সমস্ত ইউরোপ ভূমি তাঁর প্রতাপে কাঁপিত।

এই স্থান হইতে আর কিছুদূর যাইলেই ফরাসী দেশের দক্ষিণ দেশস্থ "মার্সেল" বন্দরে পৌছান যায়। সেই খান হইতেই রেলযোগে একদিনেই লণ্ডনে পৌছান যায়।

এত দিন যে নানা দেশীয় যাত্রীপূর্ণ জাহাজে একত্র থাকিয়া কতলোক কত ঘটনা অনবরত দেখিয়াছি সে কথা বড়ই বিস্ময়কর ও মনোহর।

রাত্রি পোহাইবার পূর্ব্বেই জাহাজ মার্সেল বন্দরে পৌছিল। ভোরে উঠিয়া দেখি যে, বন্দরের জেটিতে জাহাজখানি বাঁধা রহিয়াছে। এবার আমরা এই প্রথম ইউরোপের ভূমিতে আসিলাম।

তখনও লোকজন জেটিতে বেশী আসে নাই। ক্রমে ফরাসী কুলী ও জেটির কর্ম্মচারীরা আসিতে লাগিল। চা, রুটী ফেরীওয়ালা চা ফেরী করিতে আসিল। খবরের কাগজ বেচিবার জন্য কত 'হকার' আসিল। অতি কম দামের ছোট ছোট খবরের কাগজ। সে গুলিতে অল্প কথায় সহজ ভাবে দৈনিক সব খবর আছে। দামও অতি সস্তা। এক "সেন্‌টিম্" দু "সেন্‌টিম্" দাম, আমাদের আধ পয়সার সমান। সভ্য দেশের কুলিদেরও ভিতর প্রায় সকল লোকই এক একখানি কিনিল। যত নিচু অবস্থার লোক হোক্ না কেন—বা যত গরিব, যত ব্যস্তই হোক্ না কেন—দিনের মধ্যে এক সময় না এক সময় তাদের খবরের কাগজ পড়া চাই। নিজ দেশে ও অপরাপর দেশে কে কি করিতেছে তার মোটামুটি খবর রাখা চাই।

সে সব দেশে সময় অতি মূল্যবান ও ঠিক সময়ে হাজির হওয়া ও কাজ আরম্ভ করা সর্ব্বত্রই নিয়ম। সকলেই আসিয়া এক এক পেয়ালা

কার্য্য আরম্ভ করিল। তারপর ডেকে আসিয়া দেখিলাম জেটিতে টীনের গুদাম ও মাল উঠিবার নামিবার বারান্দার চারিদিক ঘেরা। বন্দরটি জাহাজে পরিপূর্ণ। দূরে দূরে আলোক স্তম্ভ ও সাঙ্কেতিক ধ্বজা পতাকা দেখা যাইতেছে। অনতিদূরে জলের উপর ছোট ছোট পাহাড়। তার উপরে সুন্দর সুন্দর বাঙ্গালা নির্ম্মিত। মার্সেলের এই বন্দরটি ভূমধ্যস্থ সাগরের একটি প্রধান বন্দর।

ইউরোপের দক্ষিণে কোনও স্থানে, বা আফরিকার উত্তরে বা এসিয়াতে কোন স্থানে যাইবার এইটিই পথ। কারণ ইউরোপের অনেক স্থান হইতে রেল আসিয়া এই স্থানে সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়া যাতায়াত করিতে ও মালপত্র চালান দিবার এইটিই সুবিধার স্থান। আর ভারতবর্ষ হইতে বিলাত যাইবার তো এইটীই প্রশস্ত পথ। একদিনেই রেলযোগে ফরাসীদেশের ভিতর দিয়া, চেনেল পার হইয়া—লণ্ডনে পৌছান যায়।

আমার বরাবর সমুদ্র দিয়া যাইবারই টিকিট ছিল, কিন্তু সমুদ্র পীড়ায় অতিশয় ভুগিয়াছি বলিয়া আর সমুদ্র দিয়া যাইতে সাহস হইল না। বিশেষ 'বে অব বিস্কে' অতি ভয়ানক স্থান। আটলাণ্টিক মহাসাগরের যত ঢেউ ও কোণে আসিয়া প্রতিহত হইয়া সমুদ্রকে বড়ই তরঙ্গময় করিয়া তুলে। এই সাত পাঁচ ভাবিয়া আরও শতাবধি টাকা খরচ করিয়া রেলপথেই যাইতে মনন করিলাম।

নামিবার সময় যে গোলমাল, যে ভিড়। সবই সুনিয়মে বাঁধা বলিয়া এত লোকের জনতায়ও তত কিছু বেবন্দোবস্ত হয় না। আগে হতেই সবাই খবর দিয়া নিজেদের নামিবার কথা জাহাজের অধ্যক্ষকে জানাইয়া রাখিবে; মোট ঘাট বন্দোবস্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। কুক্ কোম্পানী ও হেন্‌রি এস্‌কিউ, ও গ্রীনলে Cook Co. Henry Skieu, Grindlay প্রভৃতি আফিসের লোকেরা আসিয়া সকলকে সাহায্য করিয়া নামাইয়া

এতদিন যে সকল লোকের সঙ্গে একত্র বাস করিতেছিলাম, তাঁহারা সবাই বিদায় নিলেন; বিদায় লইবার কালে কতই কষ্ট হয়। অন্য কোনও কাজ নাই, এমন অবস্থায়, সুখে, এতদিন ধরিয়া, একত্র যাহাদের সঙ্গে কত অন্তরের কথা কহিয়া অহরহঃ আনন্দ করিয়াছি, তাহাদের সঙ্গ ছাড়িতে হইল—আর হয় ত ইহজীবনেও দেখা হবে না। বিদায় লইবার সময় পরস্পরের ঠিকানা ও কার্ড পরিবর্তন করা হয়। তখন মনে হয় ইহাদের সহিত বরাবর চিঠিপত্র লেখা সম্বন্ধ রাখিব। পরে কর্ম্মক্ষেত্রের দারুণ নিষ্পেষণে কিছুই আর মনে থাকে না।

"ডরোথী" নাম্নী একটি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা তার মা ও বাবার সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছিল। তাহারা ইয়র্কসায়ারের অধিবাসী। সঙ্গে দুটী ছোট বোন ছিল। সবাই যেন এক একটি মোমের পুঁতুল। জাহাজে ছেলেরা ছোট ফ্রক প'রে থাকে ও শুধু পায়ে, শুধু মাথায় হেসে হেসে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ী খেলা করিয়া বেড়ায়। তাতে যে তাদের কি সুন্দর দেখায় তা না দেখিলে বুঝান যায় না। আর ইউরোপের ও অন্যান্য সভ্যদেশের সকল স্থানেই মেয়েদের বড় আদর। আমাদের দেশেই কেবল তাহা নাই। তাই অত যত্নে ও আদরে লালিত পালিত হইয়া সে দেশের ছেলে মেয়েগুলি যেমন সুস্থ, সবল, তেমনি মিষ্টভাষী ও সুসভ্য। জাহাজে থাকিতে ডরোথী প্রায়ই আমার কাছে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া গল্প করিত। তার নিজের কথা, তার ঘরের কথা, তার বাপ-মার কথা,—আর বয়স বার বছর হইলেও যেন শিশুর মত তার সরল ভাব; আসিবার সময় সে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া জমি অবধি নামাইয়া দিয়া জাহাজে ফিরিয়া গেল।

এই সকল স্থানে 'কাষ্টম্‌সে'র ব্যাপার বড়ই কড়াকড়ি। পাছে কেহ লুকাইয়া কোনও পণ্যদ্রব্য লইয়া গিয়া ফরাসী সরকারের শুল্ক ফাঁকী

সর্ব্বাপেক্ষা তামাক, সাবান, এসেন্স, মদ ও অন্যান্য খোস পোষাকের জিনিষের উপরই বেশী সন্দেহ। ব্যবহার করিবার মত অল্প ছাড়া বেশী থাকিলেই তার উপর শুল্ক দাবী করা হয়।

এত কাজ করিতে করিতে অনেক বেলা হইয়া পড়িল। ইহার মধ্যে আরও কত লোক ফেরীওয়ালা, ভিঁখারী, গায়ক, নর্ত্তক ও দর্শক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। একত্রে কত দেশের কত রকমের লোকই এখানে দেখা যায়। এ সকল দেশের লোকের রং বড় বেশী ফরসা নহে। তা ছাড়া ইটালী, স্পেন, পর্ত্তুগ্যাল ইত্যাদি নানা দেশের লোক আসিয়া বসবাস ও ব্যবসা বাণিজ্য করে বলিয়া এখানেও অনেক শঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের রং মাটো ও চুল ও চোখের তারা কাল। তবে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য এ দেশেরই লোকের মত ভাল।

এ সকল সুনিয়মে প্রতিষ্ঠিত সুসভ্য দেশে ভিখারীরা রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে পারে না। তাহা করিলে পুলিশে তখনই ধরিয়া তাহাদের সাজা দেয় ও "ওয়ার্ক হাউসে" পাঠায়। সেখানে কাজ করিবে ও খাইতে পাইবে তার ব্যবস্থা আছে। বসিয়া খাওয়ান সে দেশের নিয়ম নয়। ভিক্ষা করিতে হইলেই কিছু বেচার ভাণ করিতে হইবে। হয় ত কোথাও ভিখারী দেশলাইয়ের বাক্স বা জামার বোতাম বা জুতার ফিতা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার নিকট হইতে সামান্য কিছু একটা জিনিস লইয়া তাহাকে যা কিছু দাও। অপর একটি ভিখারী হয়ত নাচিতেছে বা গাহিতেছে বা অন্য কিছু তামাসা দেখাইতেছে, তাহাকে তুমি কিছু দিলে। অনেক গরীব পরিবার সপরিবারে ছেলে পিলে লইয়া নাচাইয়া গাওয়াইয়া পয়সা উপায় করিতেছে। একরূপ বাজনা আছে, তাহা হাত দিয়া ঘুরাইলেই নানারূপ সঙ্গীত ও গত্ বাহির হয়। অনেকে সেরূপ বাজনা বাজাইয়া ভিক্ষা করে। শুনেছি নাকি

তাদের যন্ত্র ভাড়া দেয় আর তাতে বেশ সুদ পায়; সর্ব্বত্রই কতরূপ ফন্দী করিয়া আইনের কঠোর নিগড় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। যেমন চাপ তেমনি সে চাপ কাটাইবার উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে। সকল জীবেরই এই ক্ষমতাটুকু আছে বলিয়াই জীবের মানসিক ও দৈহিক অভিব্যক্তি হইতেছে। তাই পাখীর ডানা গজায়, মাছের সাঁতার দিবার উপযুক্ত পাখনা বাহির হয় ও ভূচরের পা জন্মায়। বাধা হইতেই সকল জীবের উন্নতি।

ইতালীদেশের ছোট ছোট মেয়েরা আসিয়াও অতি সুন্দর নাচিয়া গাহিয়া অনেক পয়সা উপায় করে। আমাদের দেশের মেয়েদেরই মত তাদের মাটো রং, কাল চুল, কাল চোখের তারা, ও সরল নম্রভাব মাখান মুখশ্রী; ছোট ঘাগরা পরিয়া করতালি দিয়া যন্ত্রের সঙ্গীতের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারা অতি সুন্দর নাচে। তাকে কি নাচ বলে জানি না।—কিন্তু কতকটা আমাদের দেশের মতই নাচ। সিঁথা কাটা খালি মাথা হইতে পিঠে লম্বা বিনানী দোদুল্যমান। আর গোল গোল হস্তগুলি কখনও বা কোমরে বিন্যস্ত, কখনও বা নানাভাবে চারিদিকে উৎক্ষিপ্ত হইয়া নানারূপ বিভ্রম দেখায়। ক্ষিপ্র পা গুলি যখন সঙ্গীতের মধুরতায় তালে তালে পড়িয়া নাচিতেছে—হস্তগুলিও তখন প্রতি হাতে এক একটী খঞ্জনী মুষ্টির ভিতর লইয়া সুন্দর তাল দিতে থাকে। আর ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিবার সময় যখন ছোট ঘাগরাটি বৃত্তাকারে ছড়াইয়া পড়িয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়, তখন দর্শকবৃন্দ অতিশয় প্রীত হইয়া—ছোট ছোট রৌপ্য মুদ্রা ছুড়িয়া তাহাদের প্রভূত পারিতোষিক দেন।

যাঁহারা বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ, কাণা খোঁড়া, তাহারা ইউনিয়ন বীণা বাজাইয়া—অনুচ্চ গম্ভীরস্বরে গান করেন। সে বীণাটী ত্রিকোণ আকৃতি, অনেক-গুলি তার বিশিষ্ট ও সাম্‌নে রাখিয়া দুই হাতেই তাড়না করিতে হয়। এই বীণাই পুরাকালে গ্রীসের বীণা ছিল। তাহার স্বর নম্র মধুর ও গম্ভীর, কিন্তু

ভাবুকের অন্তরের উচ্চভাবগুলির সঙ্গে ঠিক সুন্দর মিলান। আমাদের বীণাপাণির হাতের বীণা হইতে অল্পই প্রভেদ। তাহাদিগকে সেইরূপ অবস্থায় দেখিয়া আমার গ্রীক কবি হোমারের কথা মনে হইতে লাগিল। এক সময়ে তিনিও পেটের দায়ে বীণা বাজাইয়া দরজায় দরজায় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। লণ্ডন হইতে অনতিদূরে কাঁচনির্ম্মিত "এলেকজাড্রা পেলেসের" "Alexandra palace" এক স্থানে পাথরে খোদা একটি ছবি আছে। সেটি বড়ই সুন্দর দেখিতে। মহাকবি এক রাজার সভায় বীণা বাজাইয়া নিজেরই রচিত "ইলিয়ড" কাব্যের গান সকলকে শুনাচ্ছেন। লণ্ডনের University Collegeএরও বড় হলে ঐরূপ একটি ক্যাম্বিসের বুনা ছবি আছে। তাতে মূর্ত্তিগুলি সব উলঙ্গ। গ্রীক বীরদের সুগঠিত দেহের রেখাগুলি দেখাইবার জন্যই সে উলঙ্গ মুর্ত্তিগুলির কল্পনা। তাহাতে সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়াছে। অন্ধ কবির বীণার গানে তাঁহারা সবাই মুগ্ধ হইয়া শিথিলদেহ হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের দেশে বাল্মীকির রামায়ণ গানের সঙ্গে ইহার বড় সৌসাদৃশ্য আছে।

যে গানগুলি সেখানে শুনিলাম, সে গানগুলি অতিশয় মধুর। ইতালীর বালিকাদের নাচা সুরে গান অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন। তাতে সরল গভীর শোকের ভাব মাখান আছে। যেন অভাব ও নৈরাশ্যের কাতরোক্তির মত---তাই অত মিষ্ট।

বিলাতি জাহাজে।

যাবার সময় সমুদ্র দিয়াই যাইব ঠিক করিয়া টিকিট কিনিয়াছিলাম। কিন্তু ভূমধ্যস্থ সাগরে সমুদ্রপীড়ায় কাতর হইয়া ফরাসীদেশে মার্সেলে নামিয়া রেল গাড়িতেই উঠিতে হইল। ভূমধ্যস্থ সাগর হইতেও, "বে অফ্ বিস্কে" আরও তুফানময় স্থান। আটলান্টিক মহাসাগরের যত ঢেউ এই পথে ঢুকিয়া জাহাজকে বড়ই বিধ্বস্ত করে। এই কথা লোকমুখে শুনিয়া পুনরায় ফরাসীদেশের ভিতর দিয়াই রেল যোগে আসিয়া ফিরিবার কালে মার্সেলে জাহাজে চড়িলাম।

পথে যতগুলি বন্দর আছে—একটি হইতে অপরটিতে পৌঁছিতে প্রায় চার পাঁচ দিন বা ততোধিক সময় লাগে। এই সময়ে অনন্ত সমুদ্রের উপর ভাসিয়া কাহারও কিছু বড় করিবার থাকে না। কেবল যথাসময়ে খাওয়া দাওয়া, সময়ে সময়ে একটু লেখা পড়া করা; তাহা ছাড়া একত্র ডেকে বসিয়া খেলাধূলা ও গল্পগুজব করাই কাজ। জাহাজে একলাটি সময় যেন আর কাটে না কাজেই পরস্পরে আলাপ করিবার স্পৃহা এখানে বড়ই বলবতী হয়।

কেবল খাবার ও শোবার সময় ছাড়া সকলেই প্রায় অন্য সময় ডেকের উপর থাকেন। কেহ কেহ বা সময়ে সময়ে সেলুন অর্থাৎ বৈঠকখানার ভিতর বসিয়া লেখেন পড়েন তাস খেলেন বা গীতবাদ্য করেন। কিন্তু অধিকাংশ জনতাই ডেকের উপর। কেহ কেহ বা এখানে এক একটি হালকা বেতের বা ক্যামবিসের চেয়ারের উপর বসিয়া থাকেন কেহ কেহ বা বেড়াইতে বেড়াইতে নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তা কহেন। প্রাতর্ভোজনের পর খেলিবার সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। তখন ডেকের ই সার্ট অর্থাৎ [illegible]

খানসামা আসিয়া সব খেলিবার আসবাবগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিয়া যায়। সে সব খেলাগুলিই এমন—যে জাহাজের অপ্রশস্ত স্থানের মধ্যেও অনেক চলা ফেরা ও লাফান ঝাঁপান হয়। স্বাস্থ্যের দিকে একান্ত লক্ষ্যশীল কর্ম্মঠ ইংরাজ জাতি বসিয়া খেলা বড় ভালবাসে না। আর সাধারণতঃ সব খেলাতেই মেয়ে পুরুষে যোগ দিয়া থাকেন।—তাহাতে কত আনন্দ। আর সে দৃশ্য দেখিতেই বা কি সুন্দর! উচ্চহাসি আনন্দের রোল ও আহ্লাদের ছুটাছুটিতে ডেক তখন ভরপুর হইয়া উঠে। "কর্ডের রিং" ফেলা খেলাতে—রমণীগণ একটু নিকট হইতে রিং ছুঁড়িতে অধিকার পান—কেন না তাঁহাদের হাতে পুরুষদের মত তত তো বল নাই।

এই সব গোলমাল হইতে দূরে কোথাও বা ছোট টেবিলের চারি পাশে চারি জন বসিয়া—ব্রীজ খেলেন। সেগুলি সবই জুয়া খেলা। অনেকে বিপুল হারেন বা জেতেন। তাতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আনন্দ। দর্শকবৃন্দ তাহাদের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়ান। এই সকল খেলার জন্য চাঁদা উঠে ও কে হারিল কে জিতিল তাহার তালিকা জাহাজের নোটিসবোর্ডে লেখা থাকে।

জাহাজের দোলনাগুলিতে চড়িয়া দোলাও একরূপ খেলা। যেন সঙ্কীর্ণ জাহাজখানিতে আবদ্ধ থাকিয়াও শূন্যপথে—আকাশে উঠিতেছি মনে হয়। আর জাহাজখানি ঢেউতে বেশী দুলিলেও—দোলনায় বসিয়া থাকিলে ঢেউ বড় লাগে না।

আরও কত রকমের আনন্দ আছে। নাচ গান উৎসব প্রায় রাত্রির আহারের পরই হইয়া থাকে। যদিও সেই সময়েই সর্ব্বাপেক্ষা শীত ও ঠাণ্ডা তবুও রমণীগণ সেই সময়ে অর্দ্ধোন্মুক্ত বক্ষ ও মনোহর পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইতেন।

কোমল মধুর কণ্ঠে গান গাহেন। আর মধ্যে মধ্যে আরো অনেকগুলি মেয়ে পুরুষে নানা রকম গলা মিশাইয়া তাঁহার গানের 'কোরস' গাহিতে থাকেন। একবার সুর উচ্চ হইতে উচ্চে উঠে আবার ধীরে নামিয়া মিলাইয়া যায়—আবার উঠে আমার নামে যেন ঢেউয়ের খেলা চলে। কিন্তু কে জানে কেন—আমাদের দেশের সঙ্গীতের মত সে সঙ্গীত আমাকে তত আনন্দ দিত না। সুরে যেন সেরূপ তানের আবেশ নাই—সে গিটকিরী, গমক, ঝঙ্কার, রেশ, কিছুই নাই। সুরগুলি তীরের মত যেন সোজা সোজা চলে, দূর হইতে সেকহ্যাণ্ড করে—কোলাকোলি করে না; প্রাণমনে মেশে না; যেন "সবাই স্বাধীন সবাই প্রধান, দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান"। এই বই কোনওরূপ আত্মহারা ভাব নাই।

তার পর নাচ আরম্ভ। পিয়ানোর বাজনাটি তখন এত মধুর হয়—যে তার সঙ্গে তালে তালে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আপনিই বিদ্রোহী হইয়া নাচিতে চায়। একটি পুরুষ একটি রমণীর কোমর ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচাকেই ওয়াল্‌স্‌ নাচ বলে। সে নাচে মাধ্যাকর্ষণের গ্রহ উপগ্রহের একত্রে ঘোরার সহিত অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। পল্‌কা প্রভৃতি নাচগুলিও প্রায় ঐ রকম, কেবল তালের তফাতে নামের তফাৎ হইয়াছে মাত্র। আমাদের মত দুর্ব্বল লোকের পক্ষে সব নাচগুলিই প্রায় ক্লান্তিকর।

আমাদের সহিত একজন আসামের চা-কর সাহেব দেশে যাইতেছিলেন। তাঁর সঙ্গে একটি পনর ষোল বৎসরের ছেলে ছিল। তাহার বর্ণ আমাদের মতই শ্যামবর্ণ। পরে জানিতে পারিলাম—সে ছেলেটি উঁহারি পুত্র, এবং একটি দেশীয় স্ত্রীলোক উহার মাতা। ছেলেটি জন্মাইবার পর হইতেই তিনি তাহাকে দারজিলিঙ্গে রাখিয়া দিয়াছিলেন, ও পরে সেই স্থানে রোমানক্যাথলিক কলেজে ১৫ বৎসর অবধি শিখাইয়া এখন তাহাকে বিলাতে ইন্‌জিনিয়ারীং পড়াইবার জন্য লইয়া যাইতেছেন। সে [illegible]

রাখিয়াছিলেন। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসার পর আমাদের একজন ডাক্তারের নিকট তাহাদের সব ইতিবৃত্ত শুনিয়া বড়ই চমৎকৃত হইলাম। তার মা একটি কুলী রমণী ছিলেন। সাহেবের সুনজরে পরিবার পর হইতেই তাহাকে সে অবস্থা হইতে সরাইয়া লইয়া তিনি একটি ছোট বাড়ী করিয়া দেন ও তাহার শিক্ষার জন্ম এক মেম রাখেন। আমাদের 'রিজিড্ হিন্দু' স্বদেশী সিভিলিয়ান সাহেবের ব্যবহারের তুলনায় এ ব্যবহারটি কতই সুন্দর।

একটী যুবা পুরুষ তিনি ভারতবর্ষ বেড়াইতে আসিয়া এখন দেশে ফিরিতেছেন। তাঁহার হাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একজন পর্য্যটকের লেখা একখানি বই দেখিলাম। সে পুস্তকখানিতে ভারতবর্ষের লোকদের—বিশেষ বাঙ্গালীকে লইয়া বিস্তর নাড়াচাড়া আছে। যেমন হইয়া থাকে ইহার মধ্যে অনেক সত্য কথাও আছে অনেক মিথ্যা কথাও আছে। আমাদের সামাজিক অনেক দোষের কথা উল্লেখ করিয়া লেখক বলেন যে ভারতবাসী এখনও স্বায়ত্ব শাসনের (Self Government) উপযুক্ত হয় নাই। একটি কারণ—দেশের স্ত্রী জাতির উপর তাহারা নিষ্ঠুর ও অন্যায় ব্যবহার করে। দ্বিতীয় কারণ—নিম্নশ্রেণীর জাতিদের উপর তাহাদের দারুণ ঘৃণা ও অত্যাচার। যে ভদ্রলোকটির হাতে এই পুস্তক খানি ছিল তিনি আমাকে তাহা পড়িতে দিয়া বলিলেন, আমি আপনাদের দেশের সম্বন্ধে কিছুই জানি না—আপনি এই বই খানি পড়িয়া—আপনার মন্তব্য আমাকে বলিবেন। তাঁহার দেখিলাম ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানিতে বড়ই আগ্রহ। লর্ড কার্জ্জন সম্বন্ধেও তাঁহার সহিত অনেক কথা হইল। তাঁহার ধারণা কার্জ্জন খুব কার্য্যদক্ষ হইলেও একগুঁয়ে (Self-willed) লোক ছিলেন।

অনেক লোকের সঙ্গেই প্রায় ভারতবর্ষের কথা হইত। অধিকাংশ

সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন বা ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নহে। অধিকাংশ লোকেরই দেখিলাম মত যে—ভারতবাসী লেখা পড়া শিখিয়া বড়ই রাজদ্রোহী হইয়াছে। তারা নিজেদের দেশে ব্যবসাবাণিজ্য উন্নতি করিতে চেষ্টা না করিয়া রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা করে কেন! মনে হলো তাঁহারা সকলেই প্রায় উচ্চশিক্ষার বিরোধী। অনেকেরই ইচ্ছা আমরা চিরদিনই নিম্ন স্তরে থাকি।

অপর দুই চার জন অন্য ভাবের লোকও ছিলেন। তাঁহারা ভারত-বর্ষের কথা—বিশেষ পুরাতন হিন্দু জাতির কথা হিন্দুদর্শনের ও কাব্যের কথা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের কথা সংস্কৃত ভাষার কথা আমিও যতটা পারি তাঁহাদের জানাইতাম। মনে হইত তাঁহারা তন্ময় হইয়া শুনিতেছেন। ক্রমে আমার দল বাড়িতে লাগিল। এই প্রসঙ্গ লইয়া অনেকেই আমার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন। হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব আধুনিক রকমে বুঝাইতে পারিলে দেখিলাম উচ্চশ্রেণীর ইংরাজগণের নূতন কথার মত বড়ই হৃদয়গ্রাহী হয়। তাঁহারা মন্ত্র-মুগ্ধের মত শুনেন।

আসিবার সময় আমাদের সহিত তিনটি ইংরাজ যুবক ছিলেন তাঁহারা এইবার সিভিল সার্ভিসে পাশ হইয়া কাজে যোগ দিতে আসিতে ছিলেন। তার মধ্যে একজনের সংস্কৃতের প্রতি বড়ই অনুরাগ। তিনি পরীক্ষাতেও সংস্কৃত লইয়াছিলেন; সংস্কৃত কিছু জানেন ও শ্লোক বলিলে বুঝিতে পারেন। তিনি আমাকে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। বলিতেন আমাদের মুখ থেকে সংস্কৃত শ্লোক শুনিতে বড়ই ভাল লাগে। আর একজন প্রাচীন সিভিলিয়ান—তিনি আমার নিকট হইতে অনেকগুলি সংস্কৃত পুস্তকের নাম ও প্রাপ্তির ঠিকানা লিখিয়া লইলেন—তার ভিতর একখানি গীতা ও অপর খানি অভিজ্ঞান শকুন্তলা।

ধর্ম্মে অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বের প্রতি তাঁহাদের বড়ই অনুরাগ। তাঁহাদের কাহারও কাহারও সঙ্গে ইংরাজিতে তরজমা করা গীতা আছে—ও চৈতন্য দেবের বৈষ্ণব ধর্ম্মের (Ethics of Chaytanya) অনেক পুস্তকও দেখিলাম। আরও দেখিলাম বুদ্ধদেবের প্রশান্ত ধর্ম্মের সুবাতাস ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় অনেক লোকেরই মনে লাগিয়াছে। কেবল জাহাজে নহে, ইহা বিলাতেও দেখিয়াছি।

আমাদের দেশ সম্বন্ধে এই কথাগুলি এত বিস্তারিতরূপে বলিলাম তাহার কারণ, অন্য লোকে আমাদের বিষয় কিরূপ ভাবে দেখে এ খবর আমাদের খুবই জানা উচিত।

জাহাজে বসিয়া আমি আর একটি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, আমাদের সঙ্গীতের বিশেষ বিশেষ কতকগুলি সুর ইউরোপের লোকদের খুব ভাল লাগে। আমাদের ভিতরেই একজন মধ্যে মধ্যে পিয়োনাতে দেশীয় গৎ বাজাইতেন। আর চারিদিক হইতে লোকেরা বিশেষতঃ রমণীগণ সেই মধুর সঙ্গীত শুনিতে ছুটিয়া আসিতেন। তাঁহারা বার বার সেই গত শুনাইতে অনুরোধ করিতেন। সংস্কৃত শ্লোক ও ভারতীয় দর্শনের কথার ন্যায় ভারতের সঙ্গীতও যে পাশ্চাত্য দেশের উচ্চতর শ্রেণীর লোকদের মুগ্ধ করিতে পারে—ইহা আমি আগে জানিতাম না।

বস্তুতঃ দেশভেদে, লোকভেদে, শিক্ষাভেদে বিভিন্ন গুণের অভিব্যক্তি। আমাদের এ দেশের এই গান এই শ্লোক এই দর্শনের বিশিষ্ট গুণেই আমরা সমৃদ্ধিশালী। অন্য প্রকারে অশেষ রকমে হীন হইলেও এই হিসাবে ভারত বিশিষ্ট। তবে যে এই সামান্যটুকুতে আমাদের যে সহজেই দম্ভ আনে এই আমাদের স্বভাবের বিষম দুর্ব্বলতা।

এখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আদান প্রদানের সাধারণ নিয়মানুসারে অন্য যে সকল বিষয়ে আমরা হীন তাহা অন্য হইতে আমাদের লইতে হইবে

আছে তাহা অন্যকে দিব। পৃথিবীর অন্য দেশের সঙ্গে আমাদের এই উদার সম্বন্ধ হওয়া উচিত।

জাহাজে এই সব প্রচার করিবার যেমন সুন্দর অবসর এমন আর কোথাও নাই। এই অবসরের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে অনেক কাজ হয়। আমার মনে হয় আমরা চেষ্টা করিলে বিলাতে গিয়া এ সকল বিষয়ে সহজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারি। সেখানে এক লণ্ডনেরই অল্প আয়তনের মধ্যে যে ৪৮টি থিয়েটার আছে—তাহাতে বিদেশী আসিয়াই অধিক অর্থ উপায় করিয়া লইয়া যায়। একটা নূতন কিছুর নাম শুনিলেই তাহা দেখিতে আমোদপ্রিয় লোকেরা প্রথমে ছুটে। সেই উপলক্ষ করিয়াই ভারতের নাট্যাভিনয় ইতিবৃত্ত ও অবস্থা বিলাতে সহজেই প্রচার করা যায়। পলিটিক্যাল বা সারগর্ভ দার্শনিক বক্তৃতায় যত না হইতে পারে—অতি শীঘ্র এই প্রকারে তামাসায় তাহা সম্ভব হইতে পারে। এবং এইরূপে সে দেশের সাধারণ লোককে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে পারিলে অনেক উপকার আছে।

আমাদের জাহাজের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ ক্ষীণজীবী লোক ছিলেন। তাঁহার হাবভাব দেখিলেই মনে হইত তিনি যেন মনোকষ্টে আছেন। কে জানে কেন—এইরূপ লোকের সহিত আমার অতি সহজেই ভাব হইয়া যায়। আমি যেন তাঁহাদের সহজেই চিনিতে পারি আর তাঁহারাও কি আকর্ষণে আমার কাছে আপনিই আসেন। অল্প আলাপের পরই তিনি আমাকে অতি বিশ্বস্ত বন্ধুর মত কত কথাই যে বলিলেন। শুনিলাম তাঁহার একটি রমণীর সহিত বড়ই ভালবাসা হইয়াছে। তাঁহারও অবস্থা ভাল নয় বলিয়া আজ এগার বৎসর তাঁহাদের অপেক্ষা করিতে হইতেছে, ইচ্ছা আরও কিছু জমাইয়া বিবাহ করিবেন। কিন্তু রমণীটি গত মেলে চিঠি লিখিয়াছেন—

"জন তুমি আর অপেক্ষা করিও না। যত শীঘ্র পার চলিয়া এসো।

আশা করি আমরা একত্র হইলে দুইজনের চেষ্টায় কোনোরূপে খাওয়া পরা চালাইতে পারিব। আমার সে সাহস আছে, তুমি দ্বিধা করিও না।"

আমাদের দেশে হইলে খাবার পরবার চিন্তায় আগেই বিচ্ছেদ হয়ে যেত।

এই জাহাজে জাপান দেশের একটি ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি আমেরিকার যুক্তরাজ্য সাঁফ্রানসিস্‌কোতে ফুলের কারবার করেন। এখন জাপানীদের বাণিজ্যের বিরুদ্ধে সেখানে ভয়ানক বাদানুবাদ চলিতেছে। তাঁহার সহিত এ সম্বন্ধে কথা হইল। খর্ব্বাকৃতি লোকটি তেজে পরিপূর্ণ। এত সাহস এত প্রতিভা যেন একাকী একশত জনের মত বীর্য্যবান; তিনি উদ্ধতভাবে ইয়োরোপ ও আমেরিকাবাসীদের সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ্যে নিন্দাবাদ ও তৃণজ্ঞান করিতে লাগিলেন। স্বাধীনতার তেজ এমনিই অসীম!

তাঁর সহিত একটি জাপানী রমণী ছিলেন। নানা রঙে ঢলঢলে ফুলপাখী প্রজাপতি আঁকা কিমোনো পরা, গোল গাল গড়ণ—অতিশয় খর্ব্বাকৃতি, মাথার উপর নানা ভাবে বিন্যস্ত ফাঁপান খোপা, এই কারণ মুখখানি খুব বড় দেখায়; উচ্চ চিবুক, এবং ক্ষুদ্র চক্ষু তাতেই তাঁহাকে বড়ই সুন্দর দেখাইত। এমন আনন্দময় জীবন আর কোনও দেশের রমণীর নাই। বর্ত্তমান জাপানসম্রাট ৩০ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্যের সংস্কারকালে নূতন আখ্যা নূতন প্রথা প্রবর্ত্তন-কল্পে রাজ্যের লোকের সহিত একত্রে যে আটটি প্রতিজ্ঞা করেন তাহার মধ্যে "স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ও সমানাধিকার" একটি প্রধান। তৎপূর্ব্বে প্রায় আমাদের দেশেরই মত তাঁহাদের অনেক হীনতা ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত। কিন্তু সেই দিন হইতেই জাপানে ভাগ্য-শ্রী ফিরিয়াছে। হে ভারতবাসি! তোমরা দেশের উন্নতির জন্য এত প্রকারে চেষ্টা করিয়া বিফল হইতেছ। মানব সমাজের উন্নতির এই প্রধান উপায় একবারও ভাবনা।

মার্সেল।

সব জিনিষ-পত্র গুছাইয়া কাষ্টমের পরীক্ষা সাঙ্গ করিয়া নামিতে প্রায় ৮টা বাজিল। কাষ্টমের পরীক্ষার ব্যবস্থা ফরাসীদেশে বড়ই অসুবিধাজনক; তার কারণ, আমরা তাদের ভাষা জানি না। ইউরোপ শুদ্ধ সকল লোকই ফরাসী ভাষা জানে বলিয়া, ফরাসীরা প্রায় বড় একটা অন্যদেশের ভাষা শিখে না। সর্ব্বত্রই ইংরাজী জানা প্রদর্শক পাওয়া যায়, তাহাদের সাহায্যে দেশ বেড়ান প্রভৃতি কার্য্যে কোনই অসুবিধা হয় না।

আমরা নামিবামাত্র একটি খোঁড়া প্রদর্শক আসিয়া বলিলেন যে, তিনি ১০শিলিংএর বিনিময়ে আমাদের সারাদিন সহর দেখাইয়া বেড়াইবেন। ৬ শিলিংএ মিটমাট করিয়া আমরা তাঁহাকে সঙ্গে লইলাম। তিনি আধা-বয়সী লোক। এক উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া গিয়া দুই বৎসর পূর্ব্বে পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছে। বাড়ী "সুইটজারল্যাণ্ডে।" আর কেহই সাহায্য করিবার নাই তাই নিজেই এখন এই কাজ করিয়া চালান। তিনি দেখিতে ভদ্রবংশীয় ও অনেকগুলি ভাষা জানেন। খোঁড়া বলিয়া যে চলিবার বা কোন কাজ করিবার অভাব হয় তা নয়। সুস্থ সবল দেহে অতি দুরূহ কাজও তিনি সেই খোঁড়া পায়ে করিতে পারেন।

জেটি হইতে বাহির হইবার পথে অনেকগুলি ভাড়া-গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। তার অধিকাংশই দু'চাকার গাড়ী কতকটা টমটমের মত। গাড়োয়ানগুলি অতি সুগঠন ও বলিষ্ঠ, বেঁটে বেঁটে লাল্‌চে রংযুক্ত ও মাংসল। ঘোড়াগুলি সব "নরম্যাণ্ডি পনী।" মোটা সোটা ও উঁচু, ঘাড়ে ও পায়ে অনেক বড় বড় লোমবিশিষ্ট। তাদের সাজ এক রকম।

পিঠেও তেমনি অনুকরণ করা হইয়াছে। এরূপ কিন্তু আর কোথাও দেখি নাই। তবে এডিনবরাতেও এইরূপ ঘোড়ার সাজ। এত দূরে দূরে ছুটি স্থানে এরূপ বিষয়ে এরূপ মিল কি করিয়া হইল বুঝা যায় না। আমাদের দেশের অনেক স্থানের মত এখানকার গাড়োয়ানেরা যাত্রী লইয়া কাড়াকাড়ি করে। অবসর পাইলে তারা সবাই খবরের কাগজ পড়ে।

আমরা একখানি গাড়ী লইয়া মোটমাট বোঝাই করিয়া হোটেলের দিকে চলিলাম। সেই জেটি হইতে বাহির হইয়া সহরের রাস্তায় চাহিয়া দেখি,—গাড়ী ঘোড়ার অন্ত নাই। এমন একটি প্রসিদ্ধ বন্দরে যে এত ভীড় হইবে, তা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। গাড়ীগুলি যেরূপ স্তূপাকার মাল বোঝাই লইতেছে তা দেখিলে অবাক হইতে হয়। মালগুলি যেন স্তূপীকৃত এক একটি পাহাড়ের মত গাড়ীর উপর সজ্জিত। ঘোড়াগুলি যেমন বলিষ্ঠ, মানুষগুলিও তেমনি বলবান। তাতে কেবল একজন মাত্র চালক—তার সহিস নাই। সেই একলা ঘোড়াকে তদ্বির করে, গাড়ী হাঁকায়, মাল বোঝাই করে ও নাবায়। এদেশের লোকের যোগ্যতা আমাদের তুলনায় এত বেশী যে, অতি গুরুতর কার্য্যের ভার তাহাদের উপর দিয়াও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকা যায়। সকলেই লেখাপড়া জানে ও দেশের নিয়ম ও খবরাখবরে সুশিক্ষিত বলিয়া—সকল কার্য্য সুন্দররূপে ব্যবস্থা করিয়া করিতে পারে। আর স্বাস্থ্য এত ভাল ও মন এত প্রফুল্ল বলিয়া কাজ করিয়া আলে না।

গাড়ীগুলি এত বড় ও মাল এত বেশী বলিয়া অনেকগুলি ঘোড়া জুতিয়া গাড়ী চালাইতে হয়। এমন কি, এক একখানি গাড়ীতে ছয় কি সাতটি ঘোড়া অবধি দেখিয়াছি। আমাদের দেশে যেমন ঘোড়া পাশাপাশি জুতে, তাদের দেশে সব সামনা-সামনী; তাতে যে কি সুবিধা হয় তা জানি না; তবে এইরূপ লম্বা ঘোড়ার সারটি দেখিতে বড় বিস্ময়কর মনে

ফরাসী দেশের সব রাস্তাগুলিই অতিশয় প্রশস্ত, ভাল করিয়া বাঁধান, ও গাছ পালা দিয়া সাজান এবং দুধারে সুন্দর সুন্দর বড় বাড়ী ও দোকান দ্বারা শোভিত। রাস্তার মাঝ দিয়া দ্রুতগামী ট্রাম চলিয়াছে। সে সবগুলিই আমাদের দেশের ট্রামের মত বৈদ্যুতিক বলে চলে। কতক-গুলির তার মাথার উপর দিয়া যায়—আর কতকগুলির মাটির নিচে দিয়া নীত। একটি লম্বমান যন্ত্র, তাতে ঠেকিয়া তাহা হইতে শক্তি লয়। চওড়া রাস্তার মাঝ দিয়া ফুটপথ—আমাদের দেশের মত দুই ধার দিয়া নহে। সে ফুটপথ বা পদব্রজে চলিবার পথগুলি সব বেড়াইবার স্থান। গাছপালা ও ফুলফলে ঢাকা। তলায় সুন্দর বেঞ্চী। তাতে বসিয়া শ্রান্ত পথিক ও বিলাসীজনেরা—আরাম করেন। সে অতি সুন্দর স্থান। আমাদের কলিকাতার রাস্তা দেখিয়া তাহার কিছুই বুঝা যায় না।

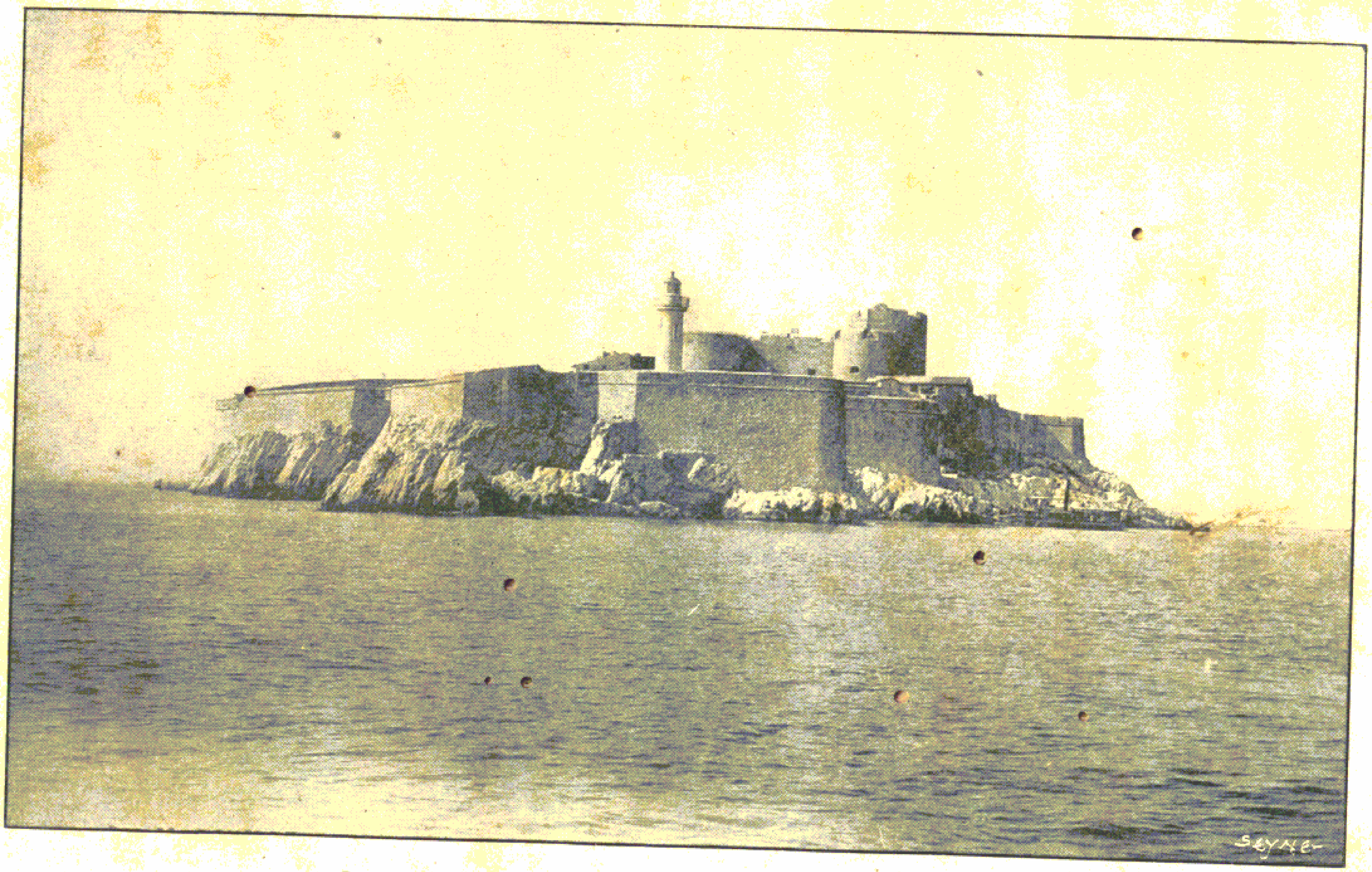
রাস্তার ধারে ধারে মাঝে মাঝে প্রশস্ত বাগান আছে—সে বাগানগুলি যে কি সুন্দর, তা বলা যায় না। সকল জিনিষই যেন হাত দিয়া গড়া। গাছগুলি ছাটা ছোটা, জমীটি কেওয়ারী করা। তাতে কিছুই বনের বন্য শোভা নাই। প্রকৃতির নিজ হাতের কিছুই রাখা হয় নাই। ফরাসী দেশের লোকেরা কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের বড়ই পক্ষপাতী। তাহারা যেমন নিজের মনের মতন করিয়া দাড়ি ছাটেন ও গালে রং লাগান তেমনি গাছপালারও বেশবিন্যাস করেন। প্রায় সব বাগানের গাছগুলিই কাটাছাটা ও খর্ব্বাকৃতি। আমাদের চোখে সে দৃশ্য বড় ভাল লাগে না। সে দৃশ্য ইংরাজ জাতিরও বড় প্রিয় নহে। তাঁহারাও আমাদের মত প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্য্য বড়ই ভালবাসেন। লণ্ডনের আশে পাশে সব বন-বাদাড় বন্য ভাবেই রক্ষিত। প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যই সেখানকার লোকে ভালবাসে। "গোলডার্স গ্রীন" পাহাড়ের নিকট "স্পানিয়ার্ড" নামক ছোট ছোট কাঁটা গাছের ঝোপগুলিও সেইরূপ ভাবেই রক্ষিত আছে। তাঁরা

কিন্তু ফরাসী দেশের সৌন্দর্য্যের আদর্শ অন্যরূপ। অথচ ইউরোপের সকল জাতিই ফরাসীদের সৌন্দর্য্য আদর্শ করিয়া তাহারই অনুকরণ করেন।

এদেশের রাস্তাঘাট যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরবাড়ীগুলিও তেমনি মাপা জোপা করে গাঁথা। সবগুলিই প্রায় একরূপ দেখিতে, একই ফ্যাসানে গড়া। তাতে সামঞ্জস্য হওয়ায় অতি সুন্দর দেখায়। দোকান ঘরগুলি অতি পরিপাটী। রাস্তার দিকের বড় বড় সব জানালাগুলি কেবল কাচ দিয়াই ঢাকা। তার ভিতরেই সব দোকানের ভাল ভাল জিনিষগুলি সুন্দরভাবে সাজান থাকে। বাহির হইতে সবই দেখা যায়। ভাল ভাল দোকানে সব জিনিষগুলির দামও সঙ্গে সঙ্গে লেখা আছে। লণ্ডনে সকল দোকানেই দাম লেখা পদ্ধতি, এখানে সর্ব্বত্র তা নাই। তবে ভাল ভাল দোকানে জিনিষ কিনিতে কিছুই দেরী হয় না—ও কোনরূপ দর দস্তরও করিতে হয় না।

এদেশে ফুলের এমন আদর যে, রাস্তায় রাস্তায় ফুলের দোকান ও ফুলের ফেরী হয়। বালিকারাই ফুল বেচেন। আর কেহও ফুল বেচিলে অমন শোভা হয় না। জল সেচন করা তাজা তাজা ফুলগুলি কেমন সুব্যবস্থায় সাজান। কত রকমই বা তার রং, কত রকমই বা আকৃতি। আর কোনও কোনও ফুল একেবারে সুগন্ধে ভরা। সতেজ কেশরগুলি সব প্রাণের আকুলতা লইয়া জাগিয়া আছে। আর ছিন্ন হইলেও, সমান আগ্রহে মধুকর আসিয়া তাদের মুখে মুখ দিয়া আদর করে।

এই সব দেশে স্ত্রীলোকেরাই বেচা কেনা করেন। সেখানে তাঁহারা পুরুষ মানুষের মতই স্বাধীন অথচ—পুরুষেরাও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান ও আদর যত্ন করেন। কাজ কর্ম্ম তো সকলেরই করা চাই। তাই তাহাদের হাতেই এইরূপ অল্প আয়াসসাধ্য দোকানে বসিয়া কাজ বেশ মানিয়াছে। ছেলের যত্নের মত জিনিষের যত্ন হয়। আর জিনিষ



ফরাসী দেশের সমুদ্রের মাঝে দ্বীপ। এই কেল্লায় নেপোলিয়ন থাকিতেন।

তাঁহারাই সব সভ্যদেশে এই কাজের উপযোগী হইয়াছেন। ছেলেপুলের বা সংসার পর্য্যবেক্ষণেরও তাতে কোন হানি হয় না। সময় মত সকল কাজ করিলেই সকল কাজ সুচারুরূপে করা যায়। হ্যাতা জোবড়া হইয়া এক কাজ লইয়াই সারাদিন বসিয়া থাকিলে কাজ ভাল হয় না।

এখানে নিম্ন শ্রেণীর রমণীরা সর্ব্বদা মাথায় টুপি দিয়া রাস্তা চলেন না। বিলাতে কিন্তু এই প্রথা সর্ব্বত্র। ইহাদের স্বাস্থ্য ও গঠন অতিশয় প্রশংসনীয়। মোটা মোটা গোল গোল হাত পা গুলি অনেকদূর অবধি খোলা। ঘাগরাটি ছোট, কামিজটির হাতকাটা, বিনানিটি মাথার উর্দ্ধদেশে বিন্যস্ত। সব সুন্দর। গলাটি অনেকটা নীচে অবধি দেখা যায়। চোখ কাল, চুল কাল, রং সাদা সাদা, আর সদা ব্যস্ত ভাব। দুষ্ট হাসির ভিতর এমন এক মধুর ভাব আছে যে, ইচ্ছা হয় দূর হইতে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখি।

পথে যাইতে যাইতে সমুদ্রধারের একটি অনুচ্চ পাহাড়ের উপর একটি কেল্লা দেখিলাম। "নেপোলিয়ন" যখন মার্সেলে আসিয়া থাকিতেন, তখন তিনি এই প্রাসাদটিতেই বাস করিতেন। এখন সে নেপোলিয়নও নাই, সে ফরাসীদেশও তেমন নাই। এখন এই স্থানে একটি হাঁসপাতাল হইয়াছে।

ফরাসীদেশের সকল গ্রাম ও নগরের অলিতে গলিতে 'কাফে' বা মদ্য পান করিবার আড্ডা। রাস্তার ধারের দোকানের বারান্দায় ছোট ছোট পরিপাটি টেবিল ও চেয়ার সাজান আছে। দুটি তিনটি লোকের এক টেবিলে বসিয়া গল্প করা চলে। আগন্তুকদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য রমণীরাই নিযুক্ত। এই সকল স্থান অতিশয় জনতাময়। বিশেষতঃ দিনের কাজ শেষ হইলে সন্ধ্যাবেলা ভিড়ের সীমা নাই। সকলেই আড্ডা দিতে এইখানে খানিকক্ষণ কাটান। সেটি এমন আনন্দের স্থান যে, খানিকক্ষণ সেই স্থানে বসিলে মনের সকল দুশ্চিন্তা

চলিয়া যায়। সকলের সঙ্গে হাসির কথা কহিতে ইচ্ছা যায়। এমন কি, সবাইকার দেখাদেখি লাল লাল একটু সুধাও চুমুক দিতে মন চায়।

এই সকল স্থান হইতে খানিকদুর মাত্র গিয়া, আমরা আমাদের গন্তব্য-স্থান Hotel de Continental "হোটেল ডি কন্টিনেণ্টালে', পৌঁছিলাম।

হোটেল কন্টিনেণ্টালে পৌঁছাইলে পর একজন সুবেশী পুরুষ আসিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া বসিবার ঘরে লইয়া গেল। মোট পত্রের ভাবনা আমাদের আর কিছুই ভাবিতে হইল না।

হোটেলটি একটি প্রশস্ত রাস্তার উপর অবস্থিত। চারিতলা বাড়ী ও ঘরদ্বারগুলি অতি পরিপাটীরূপ সুসজ্জিত। তার আশে পাশে মদ্যপান করিবার ও জুয়া খেলিবার "কাফে" ও একটি বৃহৎ থিয়েটার অবস্থিত। চারিপাশে রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। অথচ কাচের দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিলে কিছুই গোলমাল নাই।

বসিবার ঘর নানারূপ আসবাব ও ছবিতে সাজান। দেওয়ালে অনেকগুলি মানচিত্র আছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইবার পথ ও তাহার ভাড়ার কথা তাহাতেই লেখা আছে। Oriental Royal Mail নামক যে সব জাহাজ অষ্ট্রেলিয়া হইতে ডাক লইয়া কলম্বো হইয়া বিলাতে যায়, সেই জাহাজগুলি অতি বড় ও দ্রুতগামী। সেই জাহাজটিই ভারতবর্ষ হইতে বিলাত যাইবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা। এমন কি তার তৃতীয় শ্রেণী অন্য জাহাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর মত। তাহাতে ৫০০ টাকায় কলিকাতা হইতে বিলাতে যাওয়া আসা চলে।

টেবিলেও অনেক ভাষার অনেকগুলি বই ছিল, তার মধ্যে অধিকাংশই ভ্রমণবৃত্তান্ত। আমার এই বিষয় পড়িতে বড়ই ভাল লাগে। একখানি ফরাসী ভাষায় লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্তের কথা কেবল ছবি দেখিয়াই কতকটা বুঝিয়া লইলাম। দেওয়ালে আরও অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি ছিল। তার

ভাবে মাতৃভাব কি সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে! তার পাশের ছবিখানিতে কাঁটাগাছের মুকুট পরা খৃষ্টের প্রশান্ত মুখ, তার ভিতর হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে। ইহারই পাশে 'এণ্ড্রোমিডা'র নগ্ন মূর্ত্তি সমুদ্র ধারে পর্ব্বতগুহার নিকট শিকল দিয়া বাঁধা। ভীষণ বেগে তরঙ্গগুলি আসিয়া সেইস্থানে আঘাত করিতেছে। জলদস্যুর আহারের জন্যই সেই নিরীহ বালিকা সেই স্থানে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিলেন। তিনি লজ্জায় অবনতমুখী ও ভয়ে কম্পমানা। দেখিতে দেখিতে জলদস্যু তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে এক উজ্জ্বল বীরমূর্ত্তি উপর হইতে নামিয়া দস্যুকে বধ করিয়া রমণীকে উদ্ধার করিলেন। এই ভাবের চিত্র।

ঠিক সময়ে আমাদের আহারের জন্য ঘণ্টা বাজিল। ইতঃপূর্ব্বেই আমাদের মুখ হাত ধুইয়া পোষাক পরিয়া প্রস্তুত হইতে বলিবার জন্য আরও একবার ঘণ্টাধ্বনি হইয়াছিল।

কতদিন ধরিয়া জাহাজের বাসি খাবার খাইয়া সে খাবারে অরুচি হইয়া গিয়াছিল। আজ এখানে ফরাসী দেশের সুন্দর মুখরোচক রান্না খাইয়া মুখ জুড়াইল। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা এখানে অতি পরিপাটী। রান্নাও নানারূপ, রকমারী ও সুস্বাদু। সমস্ত সভ্য জগৎ এই রান্নার অনুকরণ করে। ইংরেজী রান্নায় কখনও দুটি জিনিস একত্র মিশাইয়া রাঁধিবে না। আমাদের দেশের মত এখানে কিন্তু সেরূপ খুবই চলে। দুটী তিনটী জিনিস দিয়া একটী তরকারী। তাতে মসলা দেওয়া অথচ আমাদের দেশের মত বেশী নয়। শাক সবজি খুবই প্রচলিত। ভাতও পাওয়া গেল। আলুভাজাও পাওয়া গেল। ইংরাজদের দেশে ভাজা নাই, সবই বিনা মসলায় সিদ্ধ করা, মসলা দিয়া খাইতে হয়। সব খাবারগুলিই মুখে সুমধুর লাগিল ও তৃপ্তির সহিত খাইলাম।

ছাপা পোষ্টকার্ড পাওয়া যায়। সে গুলিতে নাম ও ঠিকানা লিখিয়া বন্ধু-বান্ধবদের পাঠান যায়, তাতে সংবাদ দেওয়াও হইল, আর ছবি উপহার দেওয়াও হইল। যাঁহারা নানা দেশ বেড়াইয়াছেন এমন সব লোক এই প্রথার উপকারিতা বুঝেন। চার পয়সা করিয়া এক একখানি কার্ড ও চার পয়সা তার মাশুল, তা পৃথিবীর যে স্থানেই থাক না কেন।

আহারান্তে কিছুক্ষণ এইরূপ পোষ্টকার্ড ডাকে পাঠাইয়া খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। এক রমণী পাশের ঘরে পিয়ানো বাজাইতে লাগিলেন। পরে গাইড আহার করিয়া আসিলে সবাই একত্রে পদব্রজে তার সঙ্গে দেশ দেখিতে বাহির হইলাম।

পথের বর্ণনা পূর্ব্বেই করিয়াছি। প্রশস্ত পথে জনতার সীমা নাই। দু'দিকে সুন্দর সুন্দর দোকান। স্থানে স্থানে 'পার্ক' বা সুন্দর সুন্দর বাগিচা। কোনও কোনও স্থানে অতি সুন্দর পাথরের ছবি আছে। তার মধ্যে অনেকগুলিই ফরাসী দেশের ঘটনাপূর্ণ ইতিহাসেরই-ঘটনাবলী লইয়া কল্পিত। এক একটি পাথরের ছবি আমাদের কল্পনায় অতি সুমিষ্ট ভাব-মাখা স্মৃতি আনিয়া দেয়। একটি ছবি অতি সুন্দর দেখিলাম। সেটি ফরাসী দেশের "সাধারণ তন্ত্রের" ছবি। জর্ম্মণীর সহিত ফ্রাঙ্কো-জর্ম্মণ যুদ্ধে হারিয়া যখন ফরাসীরা রাজাকে নির্ব্বাসিত করিয়া পুনরায় সাধারণ তন্ত্র স্থাপিত করিল সেই সম্বন্ধে ছবি। "সাধারণ তন্ত্র" অস্ত্র শস্ত্র হাতে করিয়া উচ্চ প্রস্তর স্তম্ভের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। আর তার নীচে চারিদিকে অসংখ্য ছাত্রবৃন্দ সশস্ত্র হইয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া আছে। এখানেও ছাত্রেরা রাজনৈতিক আন্দোলনে এত সংশ্লিষ্ট। ফরাসী জাতিকে পরাস্ত করিয়া জর্ম্মণী যখন ফরাসী সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল, সেই সময়ে, দক্ষিণের এই স্থান অবধি আসিয়া তাহাদের গতিরোধ হয়। ছাত্রবৃন্দের প্রবল বিক্রমে ও ইটালীর রক্ষাকর্ত্তা সাধারণ তন্ত্রের পক্ষপাতী মহাপুরুষ

তাই এই প্রস্তরস্তম্ভটী গঠিত হইয়াছে। সেই স্তম্ভেরই চারিদিকে ঘেরা জমিতে সেই যুদ্ধে বিনষ্ট বীরদিগের সম্মানের জন্য অনেকগুলি "উইলো" তরু ও "ভায়োলেট" গাছ রক্ষিত আছে। উইলো গাছের পাতাগুলি সব নীচু, যেন শোকার্ত্তের বিনত মস্তকের মত। আর ঐ সুগন্ধযুক্ত ছোট ছোট ভায়োলেট ফুলের সরলতা ও পবিত্রতা ত সর্ব্বজনবিদিত।

এই স্থান হইতে কিছুদূর যাইলেই মার্সেলের প্রধান ব্যবসার স্থান "বার্স" 'burse'দেখা যায়। সে স্থানটী এমন জনতায় পরিপূর্ণ যে লোক ঠেলিয়া চলা যায় না, অথচ প্রায় সকলেরই ক্ষিপ্রগতি। সকলেরই মনে গম্ভীর চিন্তার ভাব। সম্মুখের এই অট্টালিকাতে টাকা কড়ি আদান প্রদান অনবরত চলিতেছে। কাহারও ভাগ্যচক্র নিমেষে তরঙ্গের উপর উঠিতেছে আবার কাহারও বা নিমেষে অতল জলে ডুবিয়া যাইতেছে।

এই স্থান হইতে আমরা খানিকদূর গিয়া "প্যানেডিলঙ্ চেম্পে" পৌছিলাম। সেটি মার্সেলের একটি প্রসিদ্ধ চিত্র ও ভাস্করবিদ্যার আলয়। কত ভাল ভাল চিত্র ও মূর্ত্তি সেখানে রক্ষিত আছে। বড় বাড়ীটি অনেক তলা অবধি উঁচু, সাম্‌নেই অনেকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি সজ্জিত, ঠিক মধ্যস্থলেই মুকুটপরা বর্শা হাতে সুন্দর একটি স্ত্রী-মূর্ত্তি। সেইটিই যেন ফরাসী দেশের স্বাধীন তন্ত্রের অধিদেবতা। তাঁর পাশেই দুই ধারে দুই স্ত্রী মূর্ত্তি কলাবিদ্যার প্রতিনিধি হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তার পাশে অনেকগুলি দীর্ঘকায় মাংসপেশীবহুল পুরুষের মূর্ত্তি। মধ্যের ছবিটী ছাড়া সবগুলি উলঙ্গ। তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি তাতে সুন্দর দেখা যাচ্চে। সেই মূর্ত্তিগুলির সামনেই একটি কৃত্রিম জলপ্রপাত। অনেক উঁচু হইতে স্তরে স্তরে রাশিকৃত জল তুমুলবেগে শব্দায়মান হইয়া নীচে পড়িতেছে। বাড়ীটির চারিদিকে ঘাসবিশিষ্ট সবুজে মাঠ। তার উপর ঘাসের শিষের মাঝে মাঝে অনেকগুলি "ডেজী" ও "পান্‌সী" ও "মেরীগোল্ডফুল" ফুটে রয়েছে। এ

ভিতর অনেক সুন্দর সুন্দর প্রস্তর-মূর্ত্তি ও চিত্র আছে। সাম্‌নেই রাণী। ক্লিওপ্যাট্রার সর্পবিষে মুমূর্ষু দেহ। রাণী ক্লিওপ্যাট্রার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অন্য ছবি গুলির কথা স্থানান্তরে বলিব।

এই বাড়ীটির পাশের রাস্তা দিয়া যাইলে একটি সুন্দর বাগানে পৌছান যায়। তাতে নানা জাতীয় জীব-জন্তু রক্ষিত আছে, সে স্থানটি অতি মনোহর স্থান। অনেক গুলি গাছপালায় ছায়াযুক্ত ও সুন্দর সুন্দর উঁচু-পথ চারিদিকে চলিয়াছে। আশে পাশে ফুলগাছ, তাতে যথাসময়ে আপনিই কলে গাছগুলির তলায় জল দিতেছে। মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট বিশ্রাম করিবার ও জলযোগ করিবার ঘর আছে। অনেক লোক গাছের তলায় বেড়াইতেছে, অথবা বসিয়া আরাম করিতেছে। ইহারা কখনও, কাজ না থাকিলে, ঘরের ভিতর বসিয়া থাকিতে পারে না। আর তাদের সে ঘরগুলিও, কাচের দরজা বন্ধ থাকিলে, এত ঘুপসি যে তাহাতে অনেকক্ষণ থাকিলে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে।

স্ত্রীলোকেরা বসিয়া হয় সেলাই করিতেছেন নয় নভেল পড়িতেছেন। পুরুষরা খবরের কাগজ পড়িতেছেন। কথাবার্ত্তা বড় একটা নাই। এ সব দেশে পাখী অতি কম। শুনিয়াছি লোকে পাখী মারিত বলিয়া সব পাখী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এখন এত দিন বাদে গুলি করিয়া পাখী মারা বারণ হইয়াছে। তবুও দুই একটি ছোট পাখী গাছের ছায়ায় থাকিয়া সুন্দরভাবে গান করে। এখন সবে বসন্তকাল আসিয়াছে, তাই কতকগুলি গাছের পাতা বিরল ও অপরগুলিতে ছোট চক্‌চকে নূতন পাতা গজাইতেছে।

একটি নব-বিবাহিত যুবা সৈনিক পুরুষ তার নববধূকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরস্পরের সহিত স্বাধীন ব্যবহার দেখিয়া বড়ই চমৎকৃত হইলাম। রমণীর হস্ত হ'তে সুগন্ধমাখা ছোট

কুড়ায়ে দিলেন। আবার তাঁর চলিতে চলিতে জুতার ফিতা খুলিয়া গেল, বীরপুরুষ হাঁটু পেতে বসে সে ফিতাটি সযত্নে বেঁধে দিলেন। কত মধুর স্বরে কত মধুর ভাবে হাত ধরাধরি করিয়া তাঁহারা কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ফরাসী ভাষা বলিয়া আমি কিছুই বুঝিলাম না। তবে অবশ্য হাব-ভাবে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, তাঁহারা যেন পরস্পরকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

সে বাগানে উত্তর মেরু দেশ হইতে আনীত একটি সাদা ভালুক আছে (polar bear)। অমন শীতের দেশে যার বাস, সে এমন গরম দেশে কেমন করিয়া থাকিবে। তাই তার ঘরে চাঁই চাঁই বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা। আবার গরম দেশের ফেজেণ্ট পাখীও সেখানে দেখিলাম। তারা এত কৃশ হয় নাই। সুন্দর রঙ্গের কালো কালো পাখাগুলি ও তাদের লম্বা ল্যাজ এখনও বেশ সতেজ রয়েছে। তার পাশেই একটি ময়ুর ময়ুরীকে দেখে পেকম ধরে নৃত্য কর্‌চে। ময়ুরীর পুচ্ছ নাই। তার গলার স্বর ময়ুরের স্বর অপেক্ষাও কর্কশ। তার শরীরে কোনরূপ আকর্ষণই দেখি না। তবুও তার ময়ুরের ডাকে অমনোযোগ। তার পাশে আর একটি ঘরে একটি ধূর্ত্ত শেয়াল। ধূর্ত্ত লোকের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাচ্ছিল। ইংরাজরা যাকে "জেকল" বলে ফরাসীরা তাকে বলে "জেকল"। ফরাসী ভাষার সকল কথাই অমনি মিষ্ট।

এখান হইতে কিছু জলযোগ করিয়া আমরা নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে পাহাড়ের উপর একটি ধর্ম্মমন্দির দেখিতে চলিলাম। পাথরে বাঁধান পথটি ক্রমশঃ ঢালু হইয়া উচ্চে উঠিয়াছে। পাথরে বাঁধান সরু গলির ভিতর দিয়া ভারী ভারী ঘোড়ার গাড়ী বিকট শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া ছুটিতেছে। আশে পাশে ছুতর কামার ও অন্যান্য বিষয়ের ছোট ছোট দোকান। ধোপানীরা হাত গুটাইয়া টেবিলের উপর কাপড় ইস্ত্রী করিতেছে। মদ [illegible] সে স্থানটি পরিব্যাপ্ত। অনেকগুলি দীনহীন

ভিখারী ভিক্ষা করিতেছিল। একটী অতি গরীব স্ত্রীলোক দুটি ছেলে নিয়ে পথের ধারে বসে আছেন। অনাহারে তাঁর দেহ এত ক্ষীণ যে তাঁহার বক্ষস্থল হইতেও শিশুর জন্য স্তন্য দুগ্ধ শুখায়ে গেছে। তাই শিশুটিও বড় রোগা। তারই অপর ছেলেটি ৪ বছরের, সে টুপী পাতিয়া আমাদের কাছে ভিক্ষা করিতে আসিল। সকলেই কিছু কিছু দিলাম। দূর হইতে তার মার কৃতজ্ঞতামাখা মুখ দেখিতে গিয়া অনবধানে পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে আমি পড়িয়া গেলাম। সে দেশের সভ্য লোক উচ্চ হাসি হাসিয়া আমায় লজ্জা দিল না।

সে পাহাড়ে খানিক দূর উঠিয়া আর উঠা যায় না। তার উপর অংশ এত ঢালু যে কেহ টানিয়া না তুলিলে উঠা অসম্ভব। এইজন্য এই স্থানে একটি অতি বিস্ময়কর পাহাড়ে চড়িবার রেল আছে। প্রায় খাড়াভাবেই গাড়ীখানি মোটা তারের দ্বারা টানিয়া উঠান হয়। যখন একটি উঠে তখনই আর একটি নামে। তার ভাড়া প্রতি লোক পিছু এক ফ্র্যাঙ্ক বা দশ আনা।

ক্রমে ক্রমে উঠিবার সময় চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোহর দেখায়। অল্পে অল্পে সহরের দৃশ্যপট চোখের সাম্‌নে জাগিয়া উঠিতে থাকে। সর্ব্বের উপরে উঠিলে সমস্ত সহরটী এক নিমেষে দেখা যায়।

সেখান হইতে নামিয়া আবার খানিকটা পাহাড়ে চড়িলে তবে সেই উপরকার মন্দিরে পৌঁছান যায়। সেটি রোমান কেথলিকদের ধর্ম্মমন্দির। সহরের সকল লোকের চাঁদা দিয়া নির্ম্মিত। মন্দিরের শিরোদেশে কুমারী মেরী শিশু যিশু খৃষ্টকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। মূর্ত্তিগুলি সোণার রঙ্গে গড়া। রোমান কেথলিক ধর্ম্মে খৃষ্ট অপেক্ষাও মেরীর উচ্চ পদ। প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মে তাহা কেহ স্বীকার করিতে চান না। কি সুন্দর কল্পনা! "Madona" নামে যে 'মার কোলে শিশু" সম্বন্ধে চিত্র, সে চিত্র কত

তা দেখা যায়। সকল মানুষের মনেই স্বতঃই ভগবান সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা, তাহা এই সম্বন্ধ দিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সহজে, আমাদের ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ ভাল করিয়া বুঝান যায়। ভাই বা বোনের সঙ্গে, স্ত্রী বা পুত্র কন্যার সঙ্গে, এমন কি পিতার সঙ্গেও সে ভাব এতটা নাই। পিতার কথা মনেও আসিলে যেন কতকটা ভয় মাখান গুরু মহাশয়ের কথা মনে আসে। কিন্তু মার কথা মনে হলে, অসহায় শিশু অবস্থার মত কেবলই ভালবাসা ও ভক্তি। সেই ভাবই যথার্থ ধর্ম্মভাব। আর সব ভাবই কেবল যাজকের লোকঠকান বিধান।

মন্দিরের নীচের তলার ঘরে বিবি সন্ন্যাসিনীরা নানারূপ পূজার উপযোগী জিনিস বেচিতেছেন। পিতলের বা রূপার ক্রুস, বা নাম জপ করিবার স্ফটিকের মালা, মন্দিরে জ্বালাইবার জন্য মোমের বাতি বা ধূপ-ধুনা। দোতালাতে মন্দির। তার সিংহদ্বার খুলিয়া ভিতরে ঢুকিলেই ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। তাতে অনেক রকম ধূপ ধুনা ও বাতি জ্বলে। উপরে খিলানের উপর খিলান চড়িয়া ছাত নির্ম্মাণ করিয়াছে। তার সব স্থানেই মূর্ত্তি চিত্রিত। দেয়ালেও নানারূপ বাইবেল সম্বন্ধীয় চিত্র আঁকা। কোণে কোণে প্রস্তরমূর্ত্তি। সম্মুখেও আবার সেই "শিশু যিশু কোলে কুমারী মেরী" উপবিষ্টা; ফুল ও মালা দিয়া শোভিতা। সামনেই বেদী, সেই স্থান হইতেই পুরোহিত স্তব পাঠ করেন। আর যজমানেরা দূরে দূরে থাকিয়া হাঁটু গাড়িয়া, জোড়হাত করিয়া স্তোত্র পড়িতে পড়িতে পূজা করেন। দেওয়ালে রঙ্গিণ কাঁচের জানালার ভিতর দিয়া নানা রঙ্গের আলো আনিয়া কি গম্ভীর ভাব আনে।

মন্দিরের বাহির হইতে চারিদিকে দেখিলে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা যায়। এক ধারে অপার জলধি বিস্তৃত, অপর দিকে কেবলই উঁচু নীচু জমিযুক্ত গাছপালা ও তার মাঝে ঢালু ছাতের বাড়ীর সারি, কল-কারখানা ও ভজনালয়ের উঁচু চূড়া। গেলবারকার প্রবন্ধে যে দ্বীপটিকে

নেপোলিয়ন বাস করিতেন বলিয়াছিলাম, সে দ্বীপটিও বেশ দেখা যায়। এই স্থানে বহু পূর্ব্বে গ্রীস্ দেশের উপনিবেশ ছিল। "মণ্টিক্রষ্ট" নভেলের লীলাভূমি সেই দ্বীপটিও এখান হইতে নীল জলের উপর ভাসমান দেখা যায়। নিকটেই একটি উঁচু সাঁকো, সেটির উপর দিয়া সোজা পথে গাড়ী নৌকা লোক জন ইত্যাদি পারাপার করে। বহুদূরে "প্যালেডিলঙ্গচেম্পের" উচ্চ বাড়ীটিও দেখা যায়।

সেখান হইতে নামিয়া আসিয়া আমরা সমস্ত সহরটি প্রদক্ষিণ করিবার মানসে বৈদ্যুতিক ট্রাম গাড়ীতে চড়িলাম। এখানে ট্রামভাড়া বড়ই সস্তা, দু' পয়সা খরচ করিলেই সমুদ্রের ধার দিয়া সমস্ত পথটি ঘুরা যায়। তার যে কি শোভা তা বর্ণনায় বুঝান যায় না। চওড়া চওড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তার একধারে সুন্দররূপে সাজান গাড়ীগুলি যেন ছবির মত সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, অপর দিকে সমুদ্র। রাস্তার মাঝে ও রাস্তার ধারে সুন্দর গাছ পালায় সুশোভিত বাগান। মধ্যে মধ্যে থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ, সেগুলি সব গ্রীষ্মকালে বন্ধ থাকে, শীত কালেই তার জনতা। আর অনেকগুলি ষাঁড়ের লড়াই করিবার আড্ডা আছে। সে নিষ্ঠুর খেলা—ইংলণ্ডে আইন বিরুদ্ধ, কিন্তু ফরাসী ও স্পেন প্রভৃতি দেশে তাহা এখনও প্রচলিত আছে। সমুদ্রের ধারে ধারে অবগাহন করিবার ও সাঁতার শিখিবার ঠাঁই। সমুদ্রে পাঁচির দিয়া খানিক ঘেরা আছে,—তার ভিতর ঢেউ কম ঢুকে। সেই-খানেই সাঁতার দিবার স্থান। প্রায় উলঙ্গের মত ছোট ছোট পাজামা পরিয়া নামিতে হয়। সাঁতার শিখিবার জন্য নৌকা মোতায়ান আছে। সাঁকোতে শিকল আছে। সোলানির্ম্মিত ভাসিবারও যন্ত্র আছে। আড়া-আড়ি দিয়া বাছ খেলিবার বোট আছে। পাশেই ঘেরা, কাপড় পরিবার ঘর ও জলপান করিবার জায়গা। মেয়ে পুরুষে একত্র স্নান করে। তাই জনতার সীমা নাই।

নির্ম্মিত। এ সকল স্থান বিলাসী ধনবান্ লোকের উপভোগ করিবার স্থান। শীতকালে এই সকল স্থানে লোকে লোকারণ্য হয়। খরচও অসম্ভব। আমাদের বর্ত্তমান রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড এই সকল স্থানে প্রায়ই গিয়া থাকেন। তিনি যে হোটেলে থাকেন, সেটিও দেখিলাম। সমুদ্রের ধারে একটি উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ফরাসী জাতীয় লোকেরা তাঁহাকে যারপরনাই ভালবাসে ও শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। ইংলণ্ডের সহিত ফরাসী দেশের যে চির-বিবাদ ছিল, তাহা ইঁহার রাজত্ব আরম্ভ হইবার পর হইতে মিটিয়া গিয়াছে। শুধু ফরাসী দেশের সঙ্গে কেন, এখন ইউরোপের সকল দেশের সহিতই ইংলণ্ডের সদ্ভাব। সুস্থ ও সবল দেহ মন লইয়া ইনি বেড়াইতে ভালবাসেন। রাজ্যে রাজ্যে বেড়াইয়া এইরূপ সদ্ভাব আনিয়াছেন। তাঁর দেশের ও অন্য সব দেশের লোকেরাও তাঁহাকে বড়ই ভালবাসে বলিয়া তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় রাজা। তাই তাঁর অন্যতম নাম হইয়াছে—

"Edward the peace-maker"

অর্থাৎ—"সর্ব্বত্রে শান্তিস্থাপক রাজা এডওয়ার্ড"।

প্রজার স্বেচ্ছাপ্রদত্ত এ উপাধি বড় সোজা উপাধি নয়। "Edward the Confessor" or "Richard Cour de Lion" অর্থাৎ ধার্ম্মিক এডওয়ার্ড বা সিংহের মত সাহসিক রিচার্ড, এ "শান্তিস্থাপক" পদবী হইতে বড় নয়। কেন না রাজ্য শাসনে শান্তির বাড়া জিনিষ নাই।

সুয়েজ বন্দরের মত এ স্থানটিও একটি মহাপাপের স্থান। সকল বন্দরেই অল্প বিস্তর এইরূপ হইয়া থাকে। যেখানেই ধনবান্ বিলাসী মানুষ অনেক ধন লইয়া অস্থায়ীভাবে থাকে, সেইখানেই এইরূপ প্রবৃত্তি জাগে। আসিয়া ও ইউরোপের যত সুন্দরী স্ত্রীলোকেরা অর্থ উপায় করিতে এখানে আসেন। তাঁহাদের নিমিত্ত আলাহিদা বস্তি আছে। সেই স্থানে

জন্য তাঁহাদের নিয়মিত পরীক্ষার উপর রাখা হয়, এইটি একটি সুন্দর প্রথা। প্রতি হোটেলেও গুপ্তভাবে তাঁহারা যাতায়াত করেন এবং দালালের স্বরূপ তাঁহাদের অনেক গুপ্তচরও আছে, তাহারা অলক্ষিতে শীকার উদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়।

ফরাসী দেশের চিত্রশালা।

যে চিত্রশালাটির কথা আজ লিখিতে যাইতেছি সেটি "মার্সেলের", প্যারী নগরের নহে। খুব বড় না হইলেও ইহাতে বিস্তর ফরাসী, ইতালীয় ও অন্যান্য চিত্র, এবং প্রস্তর ও অন্যান্য নানা উপকরণে গঠিত বহুরূপ সুন্দর মূর্ত্তিও আছে।

যেদিন মার্সেলে নামি সেই দিনই "হোটেল কন্টিন্যাণ্টলে"র নিকট অবস্থিত এই স্থানটি দেখিতে যাই। একজন সুইস জাতীয় প্রদর্শক আমাদের সঙ্গে ছিল। সে অনেক প্রকার ভাষা জানে। আর সে দেশের প্রদর্শকেরা ভাল করিয়া দেখাইবার ও বুঝাইবার জন্য শিক্ষা এবং চাপরাস্ পায়; একথাগুলি পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সমৃদ্ধিশালী ও জনতাপূর্ণ সেই সহরের ভিতর দিয়া খানিকদূর যাইলেই একটি উচ্চ জমীর উপর "প্যালেডি লঙ চ্যাম্প" দেখা যায়। প্রকাণ্ড প্রাসাদটি অতি পরিপাটিরূপে গঠিত। ফরাসী দেশের সকল বাড়িগুলিরই এই গুণ। এই মিউজিয়মটির সম্মুখে একটি ছোট হ্রদ।—বাটীটির উপর হইতে স্তূপাকার জলরাশি জলপ্রপাতের মত অনবরত তাহাতে আসিয়া পড়িতেছে। হ্রদটির ধারে ধারে ফুল গাছ। আর তার চারিদিকের মাট সবুজ ঘাস, ডেসি ও লিলি ফুলে ভরা। ঘাসের ভিতর ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিতেছিল, ফুলের মধ্য হইতে গন্ধ ছুটিতেছিল, আর এদিক ওদিকে সুন্দর ছোট প্রজাপতি উড়িতেছিল। ঠিক আমাদের এদেশের দৃশ্যেরই মত দৃশ্য।

উপরকার যে স্থানটি হইতে জল পড়িতেছিল সেই উচ্চ স্থানটির দিকে চাহিয়া দেখি সেখানে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মধ্যে অবস্থিতা একটি রমণীমূর্ত্তির দুই পাশে আর দুইটি রমণী সখীরূপে

দণ্ডায়মানা। এই রমণীটিই ফরাসী দেশের সাধারণ তন্ত্রের দেবতা। আর তাঁহার পার্শ্বস্থিত রমণীদ্বয়ের মধ্যে একটি "ন্যায়ের" ও অপরটি "দয়ার" প্রতিমূর্ত্তি স্ত্রীমূর্ত্তি দিয়াই সেই ভাবগুলি বড়ই উপযুক্ত হইয়াছে। সম্মুখে দুইটি মাংসপেশীবহুল নগ্নদেহ বীরপুরুষ অবস্থিত। একটির হাতে যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র; অপরটির হাতে একখণ্ড কাগজ। অর্থাৎ ন্যায়, সাম্য, দয়া দাক্ষিণ্য, শৌর্য্য বীর্য্য ও সুনিয়ম সুশাসনের দ্বারা পরিবৃত হইয়া ফরাসী দেশের সাধারণ তন্ত্রের রাজ্যলক্ষ্মী সেই মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারই পদতল হইতে সেই বারিধারা সেই স্রোতের উৎস ছুটিয়াছে। ফরাসী জাতি সাধারণ তন্ত্রের বড়ই পক্ষপাতী। সাধারণ তন্ত্রের সমগ্র, সুব্যবস্থা একত্রে এইরূপে দেখাইয়া তাঁহারা সেই মূর্ত্তিকে দেবীর মত পূজা করেন।

এসব দেশে সচরাচর বাড়ীর সামনের দরজা বন্ধ থাকে। দরজার ঘণ্টা টিপিবামাত্রই একটি রমণী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। আমরা মিউজিয়মটির ভিতর ঢুকিয়া মিউসিয়মটির নিম্নতলায় পৌঁছিলাম।

নিম্নতলাটি কেবল প্রস্তর ও ধাতুনির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তিতে পূর্ণ। তেমন সুন্দর ছবি তার পূর্ব্বে আর কোথাও কখনও দেখি নাই। সবগুলিই এত সুন্দর যে কোনটি ছাড়িয়া কোনটি দেখিব তা স্থির করা যায় না। অধিকাংশই নগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তি। ইতালীয় ও ফরাসী দেশের ভাস্কর বিদ্যার ইহা প্রধান অঙ্গ।

দ্বারদেশের প্রথম মূর্ত্তিটি রাণী "ক্লিওপেট্রা"র। সর্পাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহার কোমল শ্যামতনু শিথিল হইয়া ভূতলে পড়িয়াছে। তাঁহার হাতে স্বর্ণবলয় গাছটিও ঠিক সাপের মত জড়ান। আর ভাবমাখা চোখ দুটিও বিষে অলস হইয়া পড়িয়াছে। আত্মঘাতিনী রাণীর চারিদিকে সখীরা শোকমগ্না।

তার ঠিক পাশেই কাঁটাগাছের মুকুট পরা এক মহাপুরুষের জ্যোতির্ম্ময় মস্তক। শক্তিহীন হইয়া নত হইয়া পড়িয়াছে। একটি স্ত্রীরূপী স্বর্গীয় দূত

আসিয়া স্ত্রীসুলভ একান্ত সহানুভূতিতে নতজানু হইয়া তাঁহার শিথিল মাথাটি তুলিয়া ধরিতেছিলেন। তলায় লেখা—

"Jeasus from the cross"

অর্থাৎ ক্রুশবিদ্ধ হইবার পর যিশু খ্রীষ্টের অবস্থা।

ইহার পাশে এক বিষম মহামারীর ছবি। ৭৩৫ সালে মার্সেল সহরে যে প্লেগ হয় এ তাহারই হৃদয় বিদারক দৃশ্য। অসংখ্য লোক চারিদিকে নানাপ্রকার দারুণ রোগযন্ত্রণায় ধূলায় লুণ্ঠিত ও মুখভঙ্গী-অবস্থায় মৃত, আর তাহাদের আত্মীয়গণ চতুর্দ্দিকে আর্ত্তনাদ-পরায়ণ।

পাশের ছবিখানি আবার নগ্ন রমণীমুর্ত্তি। পরে পরে আরও অনেকগুলি ঐরূপ মুর্ত্তি আছে। একখানি "ডেফনীর" ছবি। আপেলের সঙ্গে বনমধ্যে তাঁর জীবনে যে সকল রহস্য ঘটিয়াছিল এখানে তাহারই একটি ঘটনার ছবি অঙ্কিত।

ইহার পরে বাইবেলে উক্ত কুমারীগণের প্রতিকৃতি। বরের সঙ্গে আলো ধরিয়া যাইবেন মনস্থ করিয়াও যাঁহারা প্রদীপে তেল ভরিয়া রাখেন নাই বলিয়া যাইতে পারেন নাই—বর চলিয়া গেলে তাঁহারা রোদন করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে দেখিলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্ত্রীসুলভ মধুর ভাব ও একান্ত মনোকষ্টের স্পষ্ট রেখা অতি মনোহররূপে অঙ্কিত হইয়াছে।

তাহার পাশে রোমরাজ নীরোর প্রতিমূর্ত্তি। তিনি সভামধ্যেই একান্ত বশম্বদের মত রাণীর আঁচল ধরিয়া বসিয়া আছেন। এক কৃষ্ণকায় ভৃত্য রাণীর পায়ে জরীর জুতা পরাইতেছে। রাজা নিজে বিহ্বলভাবে রাণীর কণ্ঠলগ্ন।

পাশে একটি ভাঙ্গা মন্দির খণ্ড। গ্রীক দেশস্থ কোনও মন্দিরের অংশবিশেষ হইবে। তারপর একটি না-পাখী না-মানুষ—কতকটা আমাদের দেশের গরুড়াবতার। সেটি যে কি তা বুঝা গেল না।

আর একটি সুন্দর ছবি দেখিলাম—তাহাতে মানুষ ও নিম্নশ্রেণীর জীবের সহিত একান্ত সখ্যভাব সন্নিবিষ্ট। এক রমণীর স্কন্ধে বসিয়া একটি ছোট পাখী তাহার হাত হইতে অতি বিশ্বস্তভাবে খাদ্য ভক্ষণ করিতেছে। এরূপ একটি দৃশ্য আমি পূর্ব্বেই এক জাপানী চিত্রকরের চিত্রশালায় দেখিয়াছিলাম। পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস এই চিত্রে অতি সুন্দররূপে কল্পিত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী প্রণয়চিত্রটিও অতি সুন্দর। একটি পুরুষ একটি রমণীকে অতি যত্নে তাঁর বাঁশিটি বাজাইতে শিখাইতেছেন। দুই দিকে দুইটি হাতে তাঁহার দেহ বেষ্টন করিয়া যন্ত্রটি রমণীর অধরোষ্ঠে তিনি নিজেই ধরিয়া আছেন। রমণী ফুৎকার দিতেছেন—তিনি পরদা টিপিয়া নানারূপ মধুর সুর বাহির করিতেছেন। যেন দুই জনের অন্তরের সঙ্গীত তাহাতে একত্রে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ফরাসী দেশে ও ইতালীয় চিত্রে নগ্ন রমণীমূর্ত্তির বড়ই আদর। কিন্তু মূর্ত্তিসম্বন্ধে একথা যেমন খাটে চিত্র সম্বন্ধে তেমন নহে। ইহার বোধহয় একটি কারণ এই যে—চিত্রে আশপাশের ছবি হইতেও আসল জিনিষটির গূঢ় ভাব প্রকটিত করা যায়—মূর্ত্তিতে সেটি তত সম্ভবপর নহে। তাই ইহাতে নগ্ন দেহের সনাতন অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য একেবারে খুলিয়া দিতে হয়। তবে মূর্ত্তিতে বা চিত্রে যে নগ্নভাব তাহা দ্বারা হৃদয়ে কোন মালিন্য স্পর্শ করে না।

একখানি চিত্রে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত সয়তান, অতল নরকে পড়িয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে দূরস্থ স্বর্গের আলোকের দিকে চাহিয়া—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছেন—

"Farewell Bright region !"

হে উজ্জ্বল স্থান তোমার নিকট হইতে চিরবিদায়।

ইহার পাশে এপলো অতি কাতরভাবে চোখের জল মুছিতেছেন।

সূর্য্যদেবের আবার কিসের অভাব—তিনিও যে কাঁদিতেছেন কেন কেহ কি তাহা বুঝিতে পারেন ?

তার পাশের ছবিটি একটি ভিক্ষুকের। লোকটি অনাহারে দুঃখে কষ্টে অকালে বুড়া হইয়া গিয়াছে। তাহার কটিদেশ ভগ্ন, হাতের শিরা সকল স্ফীত হইয়া জাগিয়া আছে, মাংস লোল, চক্ষু নত। দারিদ্র্যপীড়নে বা রোগে শোকে শরীর মনের তেজ নষ্ট হইলে সকলেরই এইরূপ ভাব হইয়া থাকে। যেন নিজের কাছেই নিজে তখন হীন, আর সকল বিষয়েই সকলের কাছে ভয়ের ভাব। যখনি আমি কোনও লোকের এরূপ অবস্থা দেখি তখনই আমার অহর্নিশি চাকাঘুরার কথা মনে আসে, —শুষ্ক ফুলের কথা মনে হয়। যখন ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে কাহারও অবস্থা হঠাৎ নামে তখন সেজনকে যেন আর চেনা যায় না। রোগশয্যায় এই অবস্থা আমি প্রতিনিয়তই ঘরে ঘরে দেখিতে পাই।

একখানি ছবিতে একটি বিষম শোকবার্ত্তা অঙ্কিত। বোধহয় এখানি কোনও ঐতিহাসিক চিত্র হইবে। কোন দুর্ঘটনায় একত্রে রাজবাটীর অনেকেই মৃত। তন্মধ্যে রাজারাণীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন হইয়াছে। দুটি দেহ আলিঙ্গনে বাঁধা; ছোট খোকাটি তাঁহাদের দেহের উপর রক্ষিত—আর চতুর্দ্দিকে চুল ছিঁড়িয়া মাথা কুটিয়া প্রজারা পরিতাপ করিতেছে। এটি বোধ হয় আসিয়াভূমির কোনও চিত্র হইবে। নয়ত এত শোকের বাহুল্য ত শীতপ্রধান দেশে দেখা যায় না।

তার পরের ছবিখানি ইতালী দেশের চিত্র। যাকে মধ্যযুগের ইতালীয় পেণ্টিং বলে; সেগুলি অধিকাংশ ধর্ম্মসম্বন্ধীয়। তার মধ্যে খৃষ্টের জন্ম বৃত্তান্ত একটি প্রধান। Madona অর্থাৎ যিশুমাতা বা মাতৃক্রোড়ে শিশুমূর্ত্তি কতভাবেই যে তথায় অঙ্কিত তাহার ইয়ত্তা নাই। বাস্তবিক মানুষের এমন পূজা করিবার সামগ্রী আর ত কিছুই নাই। সকল দেশেই এই মাতৃকল্পনা সকলকে স্বভাবতঃ মুগ্ধ করে। তাই এ মূর্ত্তিটির

নানা দেশে নানা ভাবে এত আদর। এক এক খানির দাম এক মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক।

তার পাশে আরও অনেকগুলি এই শ্রেণীর চিত্র দেখিলাম। একটি চিত্রে "সেণ্ট সিবাষ্টাইন" নামক জনৈক খৃষ্ট-ভক্তের উপর লোকের অমানুষিক অত্যাচার। এরূপভাবে দয়া উৎপাদন করা আজকালকার কলাবিদ্যার অনুমোদিত নহে। যেমন অতি চীৎকার গানে, অতিশয় অলঙ্কার সাহিত্যে নিষিদ্ধ, তেমন চিত্রেও অতিশয় অঙ্কনবিধিও নিষিদ্ধ। যথার্থ কলাবিদ্যায় মনের উপর ক্ষমতা বিস্তার সম্পূর্ণ অলক্ষিতে হওয়া চাই।

তার পরের ছবিখানি একটি সন্ন্যাসীর ছবি। নত জানু জোড়হাত হইয়া কুমারী মেরীর প্রতিমার তলায় বসিয়া তিনি উপাসনা করিতেছেন। এগুলি ঠিক আমাদের প্রতিমা পূজারই মত। ধর্ম্মের সকল হাবভাবই প্রাচ্য স্থানসমূহ হইতে প্রতীচ্য দেশে অনুকরণ করা হইয়াছে।

একখানি ছবিতে একটি বৃদ্ধা রমণী তাঁর ছোট নাতিটিকে প্রার্থনা করিতে শিখাইতেছেন। শিশু তাঁহাকে কিরূপ সুন্দর অনুকরণ করিতেছে! এই আদি শিক্ষার জোরেই ভালমন্দ সমস্ত বাল্যসংস্কার আমাদের মনে এমন প্রবলভাবে রাজত্ব করে।

পাশে অনেকগুলি ছবি ভাঙ্গা ও অঙ্গহীন। যে অংশগুলি ভাল আছে সেগুলি অতি সুন্দর, আর যেগুলি নাই সেগুলি কল্পনায় আরও সুন্দর!

তার পাশে প্রাচ্য দেশের একটি রাজপুত্রের প্রতিমূর্ত্তি। রাজকুমারের দেহ নানা ভূষণে ভূষিত। মাথায় জড়িবুনা ঝকমকে তাজের উপর উঠপক্ষীর পালক লাগান। গলায় গজমুক্তার মালা। যত রমণীদের জনতা সেই ছবিটির কাছে।

আর একখানি ছবিতে এক রমণী স্নানান্তে দর্পণে আপাদ মস্তক নিজের ছায়া দেখিয়া রূপে এমন মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন যে আপনারই ছায়াকে

চুম্বন করিতেছেন। প্রকৃত ছবি ও ছায়ার দুটি ঠোঁটের ব্যবধান অতি সুন্দররূপে অঙ্কিত।

ইহা ছাড়া কতকগুলি অতি সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক চিত্রও দেখিলাম। একস্থানে উচ্চ নিম্ন জমীর উপর একটি বায়ুযন্ত্র (Wind mill) অঙ্কিত। সে চিত্রটি এত সুন্দর এত স্বাভাবিক যে দেখিলে ছবি বলিয়া বুঝাই যায় না।

আর একটিতে কুয়াসার মাঝে সূর্য্যোদয়। সেটির দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিলে মনে হয় যেন কুয়াসার শৈত্য অবধি অনুভব করিতেছি।

আর একটি চিত্র একটি পুরাতন ফ্যাসানের রাজদুর্গ। ভগ্নচূড় ভীষণ প্রস্তরদুর্গের স্থানে স্থানে এখন গাছ উঠিয়াছে।

একটি ছবি দেখিয়া কিন্তু অবাক হইলাম। এটা ঠিক আমাদের দেশের মৃত্যুকালের অন্তর্জ্জলির দৃশ্য। তখন আমাদেরই দেশের মত সে দেশের রোগীকে অন্তিমকালে বাড়ী হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়া হইত। সেই আসন্নকালের বিপন্ন দেহকে টানা হেঁচড়া করিয়া গঙ্গাতীরের পরিবর্ত্তে গির্জ্জাঘরে লইয়া যাইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসাইয়া উপাসনা করান হইত। হায়! ধর্ম্মের নামে সংসারে কতই অপকর্ম্ম সংঘটিত হয়।

এই ঘটনাটি দেখিয়া আমার মন যেমন অপ্রসন্ন হইয়া গেল, আসিবার পথে আর এক স্থানে একটি ভাঙ্গা মূর্ত্তি দেখিয়া মন তেমনি কিন্তু প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সেটি "Venus of milo" অর্থাৎ মাইলো নামক আসিয়া মাইনরের একস্থানে প্রাপ্ত শচীদেবীর প্রস্তরমূর্ত্তি। এমন সুন্দর স্ত্রীমূর্ত্তি রচনা কোথাও নাই। মূর্ত্তিটির খানিক অংশ ভাঙ্গা; বাকিটুকু এত সুন্দর যে, সকল দেশে সকল শিক্ষা প্রদর্শনীতে এই মূর্ত্তির ছাঁচে মূর্ত্তি গড়া আছে। কি ভাস্কর কি চিত্রকর কি কবি কি বা গায়ক এই মূর্ত্তির অনুকরণে স্ত্রীমূর্ত্তির স্বর্গীয় সৌষ্ঠব কল্পনা করেন।

প্যারিসের পথে।

রাত্রি আটটার সময় মার্সেল হইতে গাড়ী ছাড়ে। গাইড আসিয়া অতি সুব্যবস্থায় আমাদের ষ্টেশনে গাড়ীতে চড়াইয়া দিল। সে সময় পথে যাইতে যাইতে দুই ধারের যে শোভা দেখিলাম, তাহা বর্ণনার অতীত। সন্ধ্যার পরই যত আমোদের সময়। দুই ধারের দোকানগুলি বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত। কাচের জানালা দিয়া ভিতরকার সব সাজান জিনিষগুলি সুন্দর দেখা যায়। সুসজ্জিত ফরাসী রমণীরা অতি ব্যগ্রতা ও বিভ্রমের সহিত বেচা কেনা করিতেছেন। 'কাফে'র আড্ডাগুলি জনতায় পরিপূর্ণ। সন্ধ্যাবেলার উপযোগী মিসকালো পোষাক পরা সুসভ্য লোক-গুলির হাসিমাখা মুখ দেখিলে মনে হয়, তাঁহাদের কখনও কোনও মনঃ-কষ্টের কারণ হয় নাই। নাচঘরের কাছে ভিড়ের অবধি নাই। স্থান বিশেষে রাস্তার আলো ও জনতা দিনকেও হারাইয়াছে।

আমাদের দেশের ষ্টেশনগুলিতে সর্ব্বদা তুমুল গোলমাল শুনা যায়, ও সকল দেশে এত লোকাধিক্য সত্ত্বেও ষ্টেশনগুলি অনেকটা নিস্তব্ধ। সকলেই আস্তে আস্তে কথা কয়। উচ্চরবে কথা কহা ভদ্রোচিত নহে। আর মাল পত্র বোঝাই ও লোকের যাতায়াতের এমন সুনিয়ম যে, কেহ কাহারও গায়ে গা দিয়া চলে না। সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাবার নির্দ্দিষ্ট পথ আছে।

রেলগাড়ীগুলি অতি সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সবদিকেই বড় বড় কাচে ঢাকা। কেবল দুই দিকে উঠিবার ও নামিবার দরজা আছে, তাহা কলে আপনিই খুলে ও বন্ধ হয়। সেই দরজা দিয়া ঢুকিয়া একটি বারান্দায় পড়া যায়। গাড়ীর একধারে বরাবর ঢাকা বারান্দা চলিয়াছে। আর ভিতর সারি সারি যাত্রীদের কুঠরী বা "কম্পার্টমেণ্ট"।

দুই ধারের দুই বেঞ্চী গদি দিয়া ঢাকা ও তার মাথার উপর একটু কাঠ ও দড়ি নির্ম্মিত হালকা জিনিষ রাখিবার স্থান আছে। এ সকল দেশে যাত্রীদের গাড়ীতে মোট-ঘাট লইয়া উঠিবার ব্যবস্থা নাই। কেবল হাতব্যাগ, কম্বল ও ছাতি কিম্বা ছড়ি মাত্র লওয়া চলে। এ সব দেশে বেড়াইলে বেশ বুঝা যায় যে, হাতব্যাগ কত উপকারী জিনিষ। সর্ব্বত্র যাতায়াতের জন্য এর ভিতর করিয়া অতি আবশ্যকীয় জিনিষগুলি লইতে হয়, যথা চিরুণী, বুরুষ, এসেন্স, ঘুমাবার কাপড় ও একটি সার্ট ও গেঞ্জি এবং রুমাল। সে দেশেতে তেমন ধুলাও নাই আর ধোঁয়াও হয় না। কাজেই কাপড় ময়লা কমই হয়। সপ্তাহে দুইটি কলার ও একটি সার্ট বদলাইলেই যথেষ্ট হয়। আর গরম পোষাকটি বুরুস দিয়া ঝাড়িলেই চলে।

দুখানি বেঞ্চে চারিজনার বসিবার স্থান—সবাই এক এক কোণে বসিবে। তার জন্য মাঝে বালিস দিয়া স্থান ভাগ করা আছে। আমাদের এদেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর মত শুইয়া ঘুমাবার ব্যবস্থা নাই। বসিয়া বালিস ঠেস্ দিয়া ঘুমাইতে হয়। কর্ম্মঠ দেশের লোকের এইরূপেই ঘুম উপযুক্ত। আলাদা পাতলা নরম ধোপ ফুলকাটা বালিসও ষ্টেশনে ভাড়া পাওয়া যায়। গরীব স্ত্রীলোকেরা টানা গাড়ীতে করিয়া সেই বালিস ও গায়ে দিবার কম্বল লইয়া বেড়াইতেছে। রাত্রিতে ব্যবহার করিয়া যে স্থানে নামিবে, সেই স্থানে ষ্টেসনে ফেলিয়া দিয়া যাও বালিস তার কাছে পৌছাইবে। সুনিয়ম ও সুব্যবস্থা আছে বলিয়া,কিছু চুরি যাইবার ভয় নাই। ১০সেণ্টিম বা ২ আনায় একটি বালিস ভাড়া পাওয়া যায়।

এ সকল দেশে যাতায়াতের এমন সুবন্দোবস্ত যে, সকল স্থানেই বাড়ীর মত সুবিধা পাওয়া যায়। রেলগাড়ী, ষ্টীমার বা অন্য যানবাহনে সব সুবন্দোবস্ত আছে। আর যে স্থানে ইচ্ছা থাকিতেও কোনও অবিলি নাই; তার কারণ সর্ব্বত্র সস্তা ও ভাল হোটেল পাওয়া যায়। রেলগাড়ীতেও

গাড়ীও লাগান থাকে। প্রাতঃকৃত্য ও শৌচাদি করিবার উপযোগী সকল ব্যবস্থাও আছে। পায়খানায় প্রভূত পরিমাণ গরম ও ঠাণ্ডা জল পাওয়া যায় ও সেখানে গিয়া দরজা বন্ধ করিলেই আপনি একটি লেখা বাহির হয়, তার মানে "খালি নাই"। তাতে কেউ আর না জানিয়া অনর্থক আসিয়া ঠেলাঠেলি করে না। বৃহদাকার ধোপ টোয়ালে খালি দুটি বারের মধ্যে উঁচু নীচুভাবে ঝুল্‌চে। এক যায়গায় হাত মুখ মুছাইয়া সে স্থানটি টানিয়া উঁচুতে উঠাইয়া দাও আপনিই শুকাইয়া যাইবে। কুঠারী বা যাত্রীদের বসিবার কম্পার্টমেণ্টের ভিতরও গরম জল বা ষ্টীমের নল আছে। তাহা খুলিয়া দিলে তার উত্তাপে শীতকালে ঘরটি আপনিই অতি সুন্দর গরম করে। চুরুট খাইবার জন্য কোনও কোনও ঘর আলাহিদা আছে। চুরুট খাইয়া সে ছাই যেখানে সেখানে ফেলিবার যো নাই, তার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। দেওয়ালে নানারূপ বিভিন্ন স্থানের সুন্দর দৃশ্য পট টাঙ্গান; আর জানালায় কারুকার্য্য করা পাতলা পরদাগুলি টানিয়া দিলে সব আপনা আপনিই আবশ্যক মত নামে উঠে।

আমাদের গাড়ীতে আমরা তিন জন পুরুষ ও একটি রমণী ছিলাম। নিকটে পার্শ্বের ঘরগুলির মধ্যে অনেক স্ত্রী ও পুরুষ-যাত্রী ছিলেন। ছেলে মেয়েগুলি খুব সুন্দর ও সুসজ্জিত। প্রথমে যেমন হইয়া থাকে, সবাই অজানা, সুতরাং চুপ করিয়া রহিলাম। ক্রমে থাকিতে থাকিতে দু-একটি কথা আরম্ভ হইল। সবাই কাছাকাছি আছি; কেউ বল্‌তে পারবেন না,—তিনি রমণীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে। আর ওসব দেশের কথাবার্ত্তা একত্র পাঁচজনার সঙ্গে সমানভাবেই করিতে হয়। কাহারও সহিত অনেক কথা কহিলাম, কাহারও সহিত কহিলাম না,—এমন চলে না। আলাপ ও অনুগ্রহ সবাইকে সমান ভাবে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। সেরূপভাবে অনেকক্ষণ কথা কওয়া শিক্ষাসাধ্য ও বেশীক্ষণ কহিতে হইলে আমাদের

তাহা নহে। এ রমণীটি কিছু কিছু জানিতেন, ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাবে ইংরাজী কথার ফরাসী উচ্চারণে—মনের ভাব প্রকাশ করিবার সময়, তাঁহার কথা বড়ই সুন্দর শুনাইতেছিল। তিনি ২০।২২ বৎসর বয়স্কা হইবেন, পাতলা অনতিদীর্ঘ। রমণীসুলভ সৌন্দর্য্যের সকলগুলিই তাঁর ছিল। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও আঙ্গুলগুলি ছোট ছোট ও সে দেশের যেমন দস্তুর যাতায়াত করিবার পোষাকগুলি খাটো খাটো ও আঁটা সেঁটা। চোখগুলি উজ্জ্বল ও নীল আভা বিশিষ্ট। স্বাস্থ্যে ও মনের একান্ত আনন্দে হাসি আর মুখে ধরে না। কথায় কথায় মধুর হাসি বাহির হইতে লাগিল। সে হাসি অযুচ্চ ও যথাসময়ে মনোহর হইয়া প্রকাশ পায়। সবই সুশিক্ষার বশীভূত নিয়মে মধুরভাবে আসে।

তাঁহার হাতে একখানি নভেল ছিল, তার নাম "লা আমুর" অর্থাৎ "ভালবাসা সম্বন্ধে।" এ দেশের এই বয়সের মেয়েরা প্রায়ই এই বিষয়ের সস্তা নভেল পড়িয়া থাকেন। এ দেশের লোক করুণ রসোদ্দীপক প্রস্তাবের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার সঙ্গে একটি ছোট রূপী বানরের ছানা ছিল। রমণীরা সখ করিয়া "স্প্যানিয়েল" বা ছোট কুকুর পোষেন। কিন্তু বানর পুষিতে আর কখনও দেখি নাই। সেটা এত ছোট যে একটি ছোট পেঁড়োর ভিতর রাখা যায়। তার কোমরে লাল ফিতে বাঁধা। সে যেরূপ ছোট ছোট বিস্কুট খাচ্ছিল, তা তাহারই আকৃতির উপযুক্ত। কখনও বা কর্ত্রীর মাথায় উঠে, কখনও বা তাঁর দ্বারা সাদরে ধৃত হইয়া মধুর চুম্বিত হইয়া কিচমিচ করে। সেও সুশিক্ষিত, কাহারও উপরে কোনও উৎপাত করে না।

আমাকে তিনি সচরাচর ব্যবহার করিবার মত ফরাসী ভাষায় গুটিকতক কথা শিখাইলেন—যথা "আসুন" 'বসুন' "Thank you" "Good bye." সে সব কথাগুলি এত সুশ্রাব্য যে মনে হইল যেন

আমার ভাষা শুনতে চাহিলেন, আমি ব্রজাঙ্গনা কাব্যের খানিকটা আবৃত্তি করিলাম—

"নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলীরে রাধিকারমণ।
চল সখি ত্বরা করি দেখিগে প্রাণের হরি ব্রজের রতন।"

শুনে ভারি খুসী,—বল্লেন এ যে ঠিক ফরাসী ভাষারই মত। বাস্তবিক আমারও তাই মনে হলো। মাধুর্য্য সরলতা ও দুর্ব্বলতায় দুটিই সমান।

তীরবেগে নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গাড়ীখানি উত্তর মুখে চলিতে লাগিল। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে দুই দিকের গাছ পালা তখন সুন্দর দেখাইতেছিল। মধ্যে মধ্যে যা বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত ষ্টেসন ও রেলের কারখানা বা দূরে দূরে পাহাড়। কোথাও বা ছোট বড় জলাশয়। কখনও কখনও বা নিকটবর্ত্তী কোনও পল্লীগ্রামের শান্তিময় ঘুমন্ত ছবি চোখে পড়িয়া আমাদের দেশের কথা মনে আসিতে লাগিল। আকাশটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। কতকগুলি নক্ষত্রও দূরে দূরে দেখা যাইতে লাগিল। আর কাস্তের মত ভাঙ্গা চাঁদখানিও ঠিক আমাদের আকাশের চাঁদের মত বিরাজিত ছিল।

দেখিতে দেখিতে, ভাবিতে ভাবিতে, ঢুলিতে ঢুলিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। উঠিয়া দেখি পূর্ব্বদিকে লাল আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেও ঠিক আমাদের সূর্য্যদেবেরই মত। আজ কত হাজার ক্রোশ দূরে এক ভিন্নদেশে আমার সুপ্রভাত হইল।

ফরাসী রমণীটি তখনও বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছেন। সে এমন সুন্দর হেলান দিবার ভাব যে অঙ্গের কাপড় একটুও সরে নাই, মুখের একটুও বেভাব হয় নাই। কটা কটা রঙ্গের স্থূল খোপাটি, মাথার উরদেশ যথাপূর্ব্ব অবস্থাতেই আছে।

সবাই উঠিলেন ও বাথরুমে গিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে বেশভূষা করিয়া আবার আসিয়া স্বস্থানে বসিলেন। যথাসময়ে দৈনিক খবরের কাগজ আসিল ও সবাই নিবিষ্টচিত্তে পড়িতে লাগিলেন।

তখন দিনের আলো বেশ ফুটিয়াছে। রৌদ্রও উঠিয়াছে। তবে আমাদের দেশের মত এখানে রৌদ্রের অত তেজ নাই। দুই পাশে ঢালু ঢালু সবুজ মাঠ। সবগুলি পরিষ্কার ও সুন্দর ভাবে বেড়া দেওয়া ঘেরা। ঘাসগুলি সব সমান করিয়া ছাঁটা। সকল দিকে সকল রকমেই সব জিনিস অতি যত্নে রক্ষিত। কোথাও বা ফরাসী কৃষক কলের লাঙ্গল লইয়া ঘোড়ার সাহায্যে মাটিতে লাঙ্গল দিতেছে। কোথাও কলের সাহায্যে অতি ক্ষিপ্রহস্তে ঘাস কাটিতেছে। শস্যগুলি কাটিয়া আঁটি বাঁধিয়া ছোট ছোট পালুই বাঁধা। নিকটে ও দূরে কত শত সুস্থকায় গরু ও ভেড়া চরিতেছে। তেমন সুস্থ ও সবল পশু আমাদের দেশে দেখা যায় না। ধারে ধারে ডালছাঁটা বেঁটে বেঁটে মোটা গাছের সারি। কোনও কোনও স্থানে এক একটি বসতি। তার বাড়ীগুলি অনেক তলা ঢালু ছাতের অতি পরিপাটী করে প্রস্তুত। জানালায় জানালায় ফুলের টব। সবগুলিই এক রকম দেখিতে। রেলের ধারে ধারে ও এই বাড়ীগুলির উপর সাইনবোর্ডে এডভারটিজমেন্ট দেওয়া।

দূরে পাহাড়ের উপর দিয়া অল্পস্ এর খাল চলিয়াছে। এই খালের দ্বারা আল্পস্ পাহাড় হইতে নির্ম্মল জল আসিয়া ফরাসী দেশে পান ও শস্যক্ষেত্রে সেচন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। মাঝে মাঝে তাহা হইতেই জল লইয়া কৃত্রিম নদীর বা পুষ্করিণীর মত জলাধার প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাতে কত হাঁস ও বক জাতীয় বন্য পাখী সাঁতার দেয়। তার ধারে ধারে ফুল ফুটে রয়েছে। গৃহস্থদের বাড়ীতেও ছাতে, জানালায়, উঠানে ও যেখানে সম্ভব সেই স্থানে টবে করিয়া ফুলের গাছ রাখা

দেশ আমি কোথাও দেখি নাই। আমাদের রেলপথের দুধারে দেখিবার দৃশ্য হইতে এ কত প্রভেদ।

ক্রমে আমরা বেলা ১০টার সময় প্যারী নগরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে খোলা মাঠ কমিতে লাগিল। বাড়ী ঘর বেশী বেশী দেখা যাইতে লাগিল। জনতাও বাড়িতে লাগিল। পাহাড়ের উপর বড় বড় অট্টালিকা, ভজনালয়ের চূড়া, ও কল কারখানার উচু চিমনী। আসিতে আসিতে এই সব ব্যবসার দেশে চারিদিক হইতে কত পথ ও রেলরাস্তা দেখা গেল। কলের গাড়িগুলি হাঁপাইতে হাঁপাইতে মোট ঘাট ও লোকজন লইয়া ছুটিতেছে। এই সকল স্থানে কত ঘন ঘন কল কারখানা, গুদাম ঘর, গোলা ঘর, ও পশুশালা দেখা গেল? শিক্ষিত কুকুরে পশুগুলিকে পাহারা দিতেছে। সকল গুলিরই শ্রী ও সমৃদ্ধি দেখিলে চোখ জুড়ায়।

এই স্থানে সে দেশের চাস বাস ও পশুশালা সম্বন্ধে কিছু বলি। সেগুলি সবই আমাদের দেশের শিখিবার কথা। সবই বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত নূতন প্রথায় সমাধা হয় বলিয়া এত তার উন্নতি। মাঠে অনেক স্থানে কেবল বড় বড় ঘাস বা পশুদের খাদ্যেরই চাষ হয়। মানুষের খাবার ধান যব গম তত হয় না। তার কারণ সে দেশের অধিকাংশ লোকই মাংসভোজী। ঘাস আদি জমির উৎপন্ন দ্রব্য ভেড়া গরুকে খাওয়াইয়া তাহাদের পুষ্ট ও তাজা করে ও পরে সেই গুলিকে হনন করিয়া তাদের মাংস নিজেরা খায়। এরূপ খাদ্য বড়ই বলকর। তাই এই সকল দেশের লোক এত বলশালী ও এত উন্নত। শুধু উদ্ভিজ্জ খাদ্যতে শরীরে এত বল দিতে পারে না। এখানে গরু ভেড়াগুলি যেরূপ সুস্থকায় ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও যত্নে রক্ষিত তাহা দেখিলে আমাদের বড়ই লজ্জিত হওয়া উচিত। কেননা আমরা যে দেশে গরু পূজা করি, সেই দেশে

প্রভৃতি সংসারের আবর্জ্জনা দিয়া তাদের প্রাণধারণ হয়। আর যতটুকু দুধ পাই সবই দুয়ে নিই, তাতে বাছুরের কি কষ্ট। ধর্ম্মের যদি এইরূপ দুরবস্থাই হইয়া থাকে, তবে সে ধর্ম্ম কবে বিলীন হইবে।

স্ত্রীজাতির এসব দেশে উন্নত অবস্থা দেখিলে মনে হয়, গরু বাছুর অপেক্ষাও হীন অবস্থা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের। তাঁহারা আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত কত কষ্ট কত অত্যাচারই সহ্য করেন। আমাদের দেশের ছেলেগুলিরও তেমনি দুরবস্থা; যেমন অযত্নে লালিত পালিত তেমনি দুর্ব্বল। সকল দুর্ব্বলের উপরই আমরা অত্যাচার করিতে আজন্ম অভ্যস্ত হইয়াছি। এত অভ্যস্ত যে সে ঘটনা আমাদের চারিদিকে অহরহ দেখিলেও একবারও মনে আসে না। এইরূপ নানা কারণে আমাদের নিজেদেরই নানা দোষে আমরা সকল বিষয়ে এত শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি।

যে কথাগুলি আমি উপরে লিখিলাম, সেগুলি সেই সমৃদ্ধিশালী প্যারী নগরের নিকটবর্ত্তী হইবার সময় চারিদিকের হাস্যময় দৃশ্য ও বিভব দেখিয়া আমার বাস্তবিকই আপনা আপনি মনে আসিতেছিল। তখন আমি কাহারও সহিত বাক্যালাপ করি নাই, একা এক প্রান্তে বসিয়া ছয় হাজার মাইল দূরস্থ আমার দুর্ভাগা মাতৃভূমির কথা মনে করিতেছিলাম।

অল্পক্ষণ পরেই আমরা জনতাপূর্ণ প্যারী নগরে পৌঁছিলাম।

প্যারী নগর।

বেলা প্রায় ১০টার সময় প্যারী নগরে নামিলাম, এখানে অনেকগুলি ষ্টেশন আছে। তার মধ্যে "প্যারী লয়েন"এ নামিয়া "প্যারী নর্ড" হইয়া "ক্যালে" যাইতে হয়। এ দুটি ষ্টেশনে রেলপথে যাইতে ১০।১২ মাইল। যাইতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগে। তাহার কারণ রেল লাইনটি সহর ঘুরিয়া গিয়াছে। কিন্তু ঘোড়ার গাড়ী করিয়া সোজা পথে যাইতে অতি কম দূর ও প্রায় সেই সময়ের মধ্যেই পৌঁছান যায়। তাহাতে দুই ফ্রাঙ্ক বা এক টাকা চার আনা মাত্র ভাড়া লাগে; অথচ সহরের ঠিক ভিতর দিয়া যায় বলিয়া সহরটিও দেখা হয়। তাই যাঁহারা বিলাত যাইবার পথে প্যারী নগরে একদিনও থাকেন না, বরাবর চলিয়া যান, তাঁহারা অনেকে ঘোড়ার গাড়ী করিয়াই 'প্যারী লয়ন' হইতে 'প্যারী নর্ডে' সহরের ভিতর দিয়াই গিয়া থাকেন।

যদিও প্যারী নগর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর সহর, কিন্তু আয়তনে বেশী বড় নয়। সমস্ত সহরটি লণ্ডনের সহিত তুলনায় একটি পাড়ার মত। রাস্তাঘাটগুলি সোজা সোজা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও দু-ধারের বাড়ীগুলি অতি সুন্দর ও প্রায় এক রকমই দেখিতে। মোটামুটী বলিতে গেলে মার্সেল সম্বন্ধে যে সব কথা, রাস্তাঘাট ঘরবাড়ী ইত্যাদি বিষয়ে বলিয়াছি, সকল কথাই এ সহরের পক্ষেই প্রযুজ্য। তেমনি অনেকগুলা উঁচু উঁচু বাড়ী। বড় বড় কাঁচের জানালা বসান দোকান ঘর। তাতে সুন্দরভাবে নানাপ্রকার জিনিস সাজান ও অধিকাংশ জিনিসেরই দাম লেখা। সুসজ্জিতা রমণীরা বেচাকেনা করেন। যেখানে সেখানে সাইনবোর্ড ও এডভার্টিজ-মেণ্ট। রাস্তা জনতায় পরিপূর্ণ। লোকগুলির সকলেরই ক্ষিপ্রপদ

আমাদের দেশের যেমন নানারূপ পোষাক পরা, টুপীপরা, কাল ধলা নানারঙ্গের নানাপ্রকার মূর্ত্তি একত্রে রাস্তায় রাস্তায় দেখা যায়, এ সব দেশে তেমন নয়। সবাই প্রায় একরূপ দেখিতে। অন্য দেশীয় লোক এ সব স্থানে আসিলে প্রায় সকলেই এই দেশের মতই পোষাক পরে, এবং অতি অল্পদিন থাকিলেই সংসর্গের গুণে ইহাদের মতই স্বভাববিশিষ্ট হয়। চলন সেইরূপ, হাব-ভাব ব্যবহারও সেইরূপ। এখানকার বলে নয়, ইউরোপের সকল দেশেই এ হিসাবে অনেকটা সমতা আছে। আর সেই সমতারই নিরবচ্ছিন্ন গতিতে অন্য সকলেও সেই স্রোতে পড়িয়া তাহারই সহিত এক হইয়া ভাসিয়া যায়। সেই একতাতেই সেই সব দেশের ও সমাজের কত শক্তি বাড়ে, যাহা আমাদের এদেশে এত অভাব।

তবে ইংরেজ ও ফরাসীতে দেহগত ও ব্যবহারেও অনেক তফাৎ আছে। ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশ এ দুই স্থান দেখিলে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। প্রথম প্রভেদ রঙেতে। সে কথা পূর্ব্বেও বোধ হয় বলিয়াছি। ফরাসী দেশের লোকের রঙ কতকটা সাদা সাদা দেখিতে, ইংরেজের মত অমন দুধে আলতার মত লালচে নয়।

ইতালী স্পেন পর্ত্তুগালের লোকদের মত ইহাদেরও কতকটা চুল কাল ও চোখের তারাও কাল। ইউরোপের উত্তর দেশস্থ যত লোক তাদের দক্ষিণ দেশস্থ কতকটা গরম দেশের লোকের রং হইতে এ সকল বিষয়েই তফাৎ। জার্ম্মণ ডচ নরওয়ে, সুইডেন্ ও উত্তর রাসিয়া প্রভৃতি ঠাণ্ডাদেশের লোকদের চুলগুলি লালচে, কটাকটা চোখের তারা। কাহারও বা নীল আভা মাথানো চোখ, তাহাতে স্ত্রীলোকদের মুখ বড়ই সুন্দর দেখায়। নীল তারা যে বড় সৌন্দর্য্যবিধায়ক সে কথা আমাদের দেশেও পূর্ব্বে জানা ছিল,—

"নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং

মান ভাঙ্গাবার সময় রাগে রাধিকার আরক্তিম চক্ষু দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন "নীল আভাযুক্ত তোমার চোখ দুটি এখন যেন ক্রোধে লাল পদ্মফুলের মত রাঙ্গা রাঙ্গা হয়েছে।"

এদেশের কবিদের মুখে নীল চোখ ও সোণালি রঙের চুলের বড়ই আদর শুনা যায়। কিন্তু এখানকার লোকেদের সঙ্গে কথা কহিলে জানা যায়, তারা কাল চুল কাল চোখের তারা ও কিছু মাঠ রং ভাল বাসে। সৌন্দর্য্যপ্রেক্ষী লর্ড বায়রণেরও তাই ভাল লাগিত, শেলীরও তাই বড় প্রিয় ছিল ও তাই তাঁহারা এইরূপ মূর্ত্তি দেখিতে নিজ দেশ ছাড়িয়া ইউরোপের দক্ষিণ দেশে ইত্যালি গ্রীস ইত্যাদি স্থান অহরহ যাইতে বড়ই ভাল বাসিতেন।

দেহগত আর একটি প্রভেদ দেহের দীর্ঘতায় ও স্থূলতায়। ইউরোপের দক্ষিণদেশস্থ লোকের দেহ অপেক্ষাকৃত কিছু স্থূল। ভিন্ন ভিন্ন দেশের চিত্র দেখিলে এ সব প্রভেদ বেশ বুঝা যায়। ইতালীর চিত্রকরদের চিত্রিত স্ত্রীমূর্ত্তিগুলি অনেকটা স্থূলকায়। সর্ব্বাপেক্ষা স্কটলণ্ডের লোকেরা দীর্ঘ বলিষ্ঠ ও সুগঠন। তাহারা ইংরাজ হইতেও অনেকটা লম্বা ও বলবান্; দেখিতে রংও আরও অনেকটা ফরসা ও লালচে। স্কটলণ্ডে লোকেরা আরও বেশী শীর্ণ ও সেটি পর্ব্বতময় দেশ বলিয়াই বোধ হয় এই পার্থক্য দেখা যায়। লণ্ডন হইতে এডিনবরার স্বাভাবিক তাপ ১৫ ডিক্রী কম। সে বড় সোজা শীত নয়। আর পাহাড়ে উঠা নাবা করার জন্য দেহ অস্থিময় ও মাংশপেশী বহুল হয়। জর্ম্মাণ দেশের লোক ইংরাজ হইতে বেঁটে ও স্থূলকায় ও চেহারায় তত লালিত্য নাই। কিন্তু ফরাসীদেশের লোকদের চেহারার কোমলতা ও লালিত্য বেশ আছে। তবে যেমন পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহারা কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের বড়ই পক্ষপাতী বলিয়া দাড়ি গোঁফ ছাটা ও গালে রং লাগানতে সৌন্দর্য্য না বাড়িয়া বরং আরও কমিয়া যায়

কতকটা কোমলতা ও মিষ্টতা আছে, তাদের চেহারাও তেমনি আমাদেরই মত দুর্ব্বলতা সূচক। যদিও ফরাসী জাতি এককালে এত প্রতাপশালী ছিলেন ; কিন্তু সে বুদ্ধিবলে। চেহারা দেখিলে মনে হয় না যে তাহারা বড় বলিষ্ঠ ও সৌর্য্যবীর্য্য সম্পন্ন। বীর দেহ লালিত্য মাথা দেহ হতে প্রভেদ। প্রথমটিতে প্রকাশ্যভাবেই শক্তি অঙ্কিত থাকে। দ্বিতীয়টি অলক্ষিতে তাহা অপেক্ষাও প্রবল।

নিম্নোক্ত এই কথাটি ফরাসী দেশের সৈন্যগণকে ও পুলীশের লোকদের দেখিলে বেশ বুঝা যায়। ফরাসী সৈন্যগুলি অতিশয় খর্ব্বাকৃতি, দেখিতে গরীব ও দুর্ব্বল ; তাহাদের পোষাকও বড় ময়লা। রাস্তা চলিবার সময় অন্যত্র সৈন্যগণ যেমন ঠিক একত্র পা ফেলিয়া চলে তাদের তেমন নয়। তারা তেমন সুযত্নে রক্ষিত হয় না কেন কে জানে? অতিশয় স্বাধীনতা ও বিলাসবিশিষ্ট দেশে বোধ হয় অতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই পেটের দায়ে সৈন্য হইতে যায়, অন্য কেহ যায় না।

আর পুলীশের ব্যবস্থাও তদ্রূপ। যে কেহ লণ্ডনের পুলীশ দেখিয়াছে, সে আর সে মূর্ত্তি ভুলিবে না। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ বীরপুরুষের ন্যায় তাদের আকৃতি। কেহই ৬ ফুটের বা চারি হাতের কম নহে। আর তেমনি গম্ভীর মূর্ত্তি। শিক্ষাও তদনুরূপ। তারা বাছিয়া বাছিয়া সংগ্রহ করা। পুলিসের কার্য্যের নানা আবশ্যকীয় বিষয়ে অনেক দিন ধরিয়া শিক্ষিত হইয়া তবে তাহারা কাজে বাহির হয়।

মাহিয়ানাও অনেক বেশী। পোষাকও অতি সুন্দর। ইহারা পথিককে সকল বিষয়েই সাহায্য করিতে পারে। যদি তুমি সে বৃহৎ আজব সহরে পথ হারাইয়া তাকে বল "কোন পথে যাইব?" সে ঠিক পথ বুঝিয়া দিয়া তোমাকে সাহায্য করিবে। সর্ব্বাপেক্ষা মানুষের যে সদ্‌গুণ অর্থাৎ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম পালন তাদের তা বিলক্ষণ আছে। ফল কথা, রাস্তায় অবিশ্রান্ত গাড়ী ঘোড়ার ভিড় ও জনতা যে অবলীলাক্রমে ব্যবস্থা করিয়া চালায়। চৌমাথায়

মধ্যে দাঁড়াইয়া হাতের সঙ্কেত করিলেই চল্লিশপঞ্চাশখানি গাড়ি একত্র থামিয়া যায়। আর সুশিক্ষা ও বেশী মাহিয়ানা পায় বলিয়া পুলীশের চিরপ্রসিদ্ধ ঘুস্ লওয়া দুর্নাম তাদের মোটেই নাই। ফরাসীদেশেও তেমন পুলীশ নাই আমাদের দেশেও নাই।

প্যারী সহরে টেক্সিমিটর নামক গাড়ী চলে। সে গাড়ী অতিদ্রুতগামী ও যত সময়ে যতদূর যাইল তার সব তালিকা আপনিই একটি ঘড়ির মত যন্ত্রে লেখা হইয়া যায়। সেই কারণ ভাড়ার জন্য গোলমাল করিতে হয় না। এই বড় সুবিধা। এ সব দেশে হোটেলের সংখ্যা নাই। রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে হোটেল। অধিকাংশ লোকেরই বশত বাটী নাই। তাঁহারা হোটেলে বস বাস করেন। পয়সা খরচ করিতে পারিলে এমন আবাসের স্থান আর নাই। নিজের বাড়ীতে অমন আবাস করিতে তার ১০ গুণ খরচ হয়। রাজভোগ ইউরোপের সর্ব্বত্রই অতি শস্তা। পাঁচ-জনে একত্র মিলিয়া মিশিয়া কাজ করে বলিয়া এরূপ কাজ এমন সুবিধা ও সস্তা হয় যে সে সকলেই উপভোগ করিতে পারে। আমাদের দেশে সে একতার অভাবে ভোগ্য বস্তু শুধু ধনী লোকের জন্যই সম্ভব।

এই টেক্সিমিটারে যাত্রী লইয়া সস্তায় সহর দেখাইবার জন্য কুক্ কোম্পানী অতিসুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। ছয় ফ্রাঙ্ক বা প্রায় প্রতি জনের চারি টাকা ভাড়ায় যাত্রীদের অনেককে একত্রে সহর ঘুরাইয়া লইয়া আসা হয়। মধ্যে মধ্যে নামিয়া কোনও কোনও প্রসিদ্ধ স্থান ভাল করিয়াও দেখা যায় বটে কিন্তু আরও সময় দিয়া সব স্থান ভাল করিয়া দেখিলে ভাল হয়। তার দরুণও আলাহিদা সস্তা বন্দোবস্ত আছে। তা ছাড়া সে সব দেশে যাতায়াতের ও যেখানে সেখানে থাকিবার এমন সুবিধা যে অন্যান্য কত কোম্পানীরাও গ্রীষ্মকালে সস্তায় একত্র অনেক যাত্রী লইয়া দেখাইবার এইরূপ ব্যবস্থা করেন। সে দেশে গ্রীষ্মকালই বিশ্রামের ও বেড়াইবার দিন। সকল যানবাহন তখন

সস্তায় যাত্রী লইয়া যায়। লণ্ডনে "পলিটেকনিক" নামক "রীজেণ্টষ্ট্রীটে" যে সাধারণের জন্য নানা বিষয়ের সন্ধ্যাকালে অধ্যয়নের জন্য বিদ্যালয় আছে তাহারাও দেশভ্রমণ করা বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এই ধারণায় অতি সস্তায় দেশভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৫ পাউণ্ড খরচ করিলেই বিলাত হইতে সুইজারলণ্ড অবধি সাতদিনের মধ্যে দেখাইয়া আনে। এমনি সস্তায় অন্য সর্ব্বত্র যাইবার ও ব্যবস্থা আছে।

যাইবার সময়েও প্যারী হইয়া গিয়াছিলাম, আসিবার সময়েও সেই নগর দিয়া আসিয়াছি। ফিরিবার কালেই সেই স্থানে কিছুদিন ছিলাম। যাইবার সময় প্রথম প্রথম আমরা বড়ই আনাড়ি থাকি বলিয়া সে সময়ে ইউরোপের দেশ ভ্রমণ করা বড় সুবিধা হয় না। আসিবার সময় ওরূপ কাজ বড়ই অভ্যস্ত হইয়া যায়। তাই সেই সময়েই প্যারী নগরে অল্পদিন মাত্র থাকিয়া অনেকগুলি দেখিবার স্থান দেখিয়াছি।

আসিবার সময় যখন প্যারী নগরে পৌঁছি, তখন ভোর ৫টা। সে সব স্থানে সে সময় দুপুর রাত্রির মত অন্ধকার থাকে। তবে ষ্টেশনটি ও সমস্ত নগরটি আলোয় আলোকিত। তখন নভেম্বর মাসের শেষ। খুব শীত পড়চে ও অত্যন্ত কুয়াশা হয়ে ছিল। সারা পথ গাড়ীতে ঘুমাইয়া ছিলাম। গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছাইলে তবে ঘুম ভাঙ্গিল ও তাড়াতাড়ি নিজের জিনিষ পত্র লইয়া নামিলাম। হাতে হাতব্যাগ ও গায়ে দিবার কম্বল, ছাতি ও ছড়ি বগলে। এ সব দেশে প্রায়ই নিজের মোট নিজেই বহিতে হয়, তাতে কিছুই অপমান নাই।

কিন্তু নেবে মহা মুস্কিল হলো। কাহাকেও কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেহই ভাষা বুঝে না। ইংরেজি খুব কম লোকেই বুঝে। এমন কি হোটেল বা ষ্টেশন প্রভৃতি নানাদেশের যাতায়াতের স্থানেও ফরাসী দেশে ইংরেজী জানা লোক খুব কমই দেখিলাম। সকল জাতিই ফরাসী ভাষা শিখে বলিয়া তাঁহারা আর অপরের ভাষা শিখে না। আমার ইচ্ছা ছিল ইষ্টি-

সনের "বসিবার" ঘরে খানিকক্ষণ বসিয়া রাত্রি কাটাইয়া প্রাতঃকালে কোন হোটেলে যাইয়া থাকিব। কিন্তু পথ জানি না ঘাট জানি না, আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবারও যো নাই। তখন কি করি, অনন্যোপায় হইয়া পকেট হইতে কুক্ কোম্পানীর তরজমার বই লইয়া তাহা হইতে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সে পুস্তকখানির এক সিংলিং বা বার আনা দাম। তাতে ভ্রমণকারীর আবশ্যকীয় সকল কথা বিভিন্ন ভাষায় ছাপান পাশাপাশি লেখা আছে। যথা ইংরেজী, ফরাসী, জর্ম্মণ ও ইতালীয়। আমি সেই সকল আবশ্যকীয় স্থান খুলিয়া হাত দিয়া তাহাদের দেখাইতে লাগিলাম ও সেই অনুসারে তাহারা আমাকে বসিবার ঘর দেখাইয়া দিল।

সেই রাত্রে সে ঘরে দেখি ফরাসী রাজ্যের নিম্ন শ্রেণীর অনেক রমণী যাত্রী ভাল করিয়া বসিয়া আছেন। এক কোণে আগুন জ্বলিতেছে ও অনেকে সেখানে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। চেয়ার বেঞ্চগুলি এমন করিয়া জুড়িয়া বসিয়া আছেন যে, কোথাও বসিতে গেলেই গায়ে গা না দিয়া বসিতে পারা যায় না। তাঁদের বেশ ভূষাও সেই সময়ের উপযোগী। পোষাকগুলি কতক খোলা, মাথায় টুপি নাই, চুলগুলি অর্দ্ধেক এলান। অনেকেই এক একটি পুরুষের সঙ্গে একত্র বসিয়া নানারূপ হাস্যরহস্য করিতেছেন। একটিও ভাল স্ত্রীলোক বলিয়া মনে হইল না। শুনিয়াছিলাম ব্যভিচার সম্বন্ধে এরূপ অনিবারিতদ্বার আর কোথাও নাই। সকলরূপ কার্য্যের জন্যই এ সকল স্থানে নানারূপ গুপ্ত সঙ্কেত আছে। সে সঙ্কেত অন্যে বুঝে না। তাঁহারা পরস্পরে বুঝেন। সেইরূপে কথাবার্ত্তা করিতে লাগিলেন। তবে প্রবল স্বাধীনতার দেশ কিনা। কাহারও উপর অন্যায় ব্যবহার বা বাড়াবাড়ি চলে না! গাম্ভীর্য্যের মার নাই। সে স্থানে কিছুক্ষণ মাত্র গম্ভীরভাবে বসিয়া তাহাদের হাব ভাব দেখিয়া পরে কক্ষান্তরে চলিয়া গেলাম।

কিন্তু সেখানেও আরও খানিকক্ষণ এদিক্ ওদিক করিয়া পরে এক গাড়োয়ানকে সঙ্কেতে জানাইলাম যে আমি কোনও নিকটবর্ত্তী হোটেলে যাইতে চাই। সে আমাকে কাছেই এক রেলওয়ে হোটেলে লইয়া গেল।

সে হোটেলটি একটি মধ্যবিৎ রকমের হোটেল। তখনও অন্ধকার আছে বলিয়া সে হোটেলওয়ালা আমাকে একটি শুইবার ঘরে লইয়া গেল। তার স্ত্রী আসিয়া আমার বিছানা পাতিয়া দিয়া গেলেন। তবে কাহারও সহিত একটি কথারও বিনিময় হইল না। "পালিভূ আঙ্লে।" এই কথাটির মানে "এখানে ইংরাজী জানা লোক আছেন।" হোটেল ওয়ালারা ইংরাজী ভাষী লোকদের এই আশ্বাস দিয়া থাকিতে অনুরোধ করেন। পরে যদি বলা যায় "কে সে লোক তাকে একটু ডেকে দাও, দুটা কথা জিজ্ঞাসা করি" তো বলে সে এইমাত্র বাহিরে গেছে এখনি আসিবে। এইরূপ ব্যাপার প্রায় যতগুলি স্থানে গিয়াছি সর্ব্বত্রই দেখিয়াছি।

সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া উঠিয়া মুখ ধুইয়া কাপড় পড়িয়া খাইবার ঘরে খাইতে গিয়া দেখি রাশি রাশি নীচ শ্রেণীর লোকেরা আসিয়া কফি বিয়র ও ডিম সিদ্ধ আহার করিতেছে। তাহারা সব নীচশ্রেণীর কারিগর লোক, খুব সকালে কাজে যাইতে হয় ও সেই পথে এই স্থান হইতে কিছু চা ও বিয়র পান ও জলযোগ করিয়া থাকে। পাঁচ হইতে ১০ সেন্টিম (দুই আনা) দিলেই ওই সব পাওয়া যায়। যতগুলি লোক ছিল তাদের অধিকাংশ লোকের হাতেই এক একখানি ছবিওয়ালা দৈনিক খবরের কাগজ। সবাকারই দিনের আরম্ভে একটু খবরের কাগজ পড়া চাই। পরে তারা সে কাগজখানি কোনও দোকান ঘরে কি গাড়ীতে বা রাস্তার নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া যায়। ও পরে যথা নিয়মে সংগৃহীত হইয়া সেই সকল কাগজ দরিদ্র আশ্রমে ও হাঁসপাতালের রোগীদের জন্ম প্রেরিত হইয়া থাকে। সে দেশে কোনও আবশ্যকীয় জিনিষ অপচয়

সেখানে সেই অল্প ক্ষণমাত্র থাকিবার জন্য আমাকে ৮ ফ্রাঙ্ক বিল দিল। নিশ্চয় মনে হইল এরূপ হোটেলের পক্ষে বেশী চার্জ্জ হইয়াছে। তারা সে দেশে এই সকল স্থানে লোক ঠকাইতে পারিলে আর ছাড়ে না।

সেখান হইতে একখানি টেকসিমিটর লইয়া বোম্বাই সহরের পরলোকগত মহাত্মা পার্শী ব্যবসাদার ধনকুবের দাতা স্বদেশহিতৈষী স্বনামধন্য কার্য্যবীর জেমসেটজী টটার আপিসে, চলিলাম। তাঁহারা বহু যত্ন করিয়া ভারতবাসীকে সকলরূপে পরামর্শ দিয়া সাহায্য করেন। এই উন্নতিশীল বর্দ্ধিষ্ণু জাতির মধ্যে স্বজাতিপ্রিয়তা এতই বেশী যে, তাঁহাদের সকল বড় বড় কার্য্যেই পার্শি কর্ম্মচারী রাখা হয়। তারাও সে সব দেশে থাকিয়া যেন ফরাসী দেশবাসীর মতই হইয়া গিয়াছে। ভাল স্থান ও ভাল সংসর্গের এমনই গুণ। সেইরূপ স্বাধীনভাবে তৎপরতার সহিত বিনা অধিক বাক্যব্যয়ে দেশ বেড়াবার আবশ্যকীয় কথাগুলি সব সংক্ষেপে বলে দিলেন। দেহে স্বাস্থ্য ও মনে স্বাধীনতার ভাব সে দেশে থাকিয়া কত ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেখানে বম্বের অন্য লোকও দেখিলাম, মাদ্রাজের লোকও দেখিলাম, পঞ্জাবের লোকও দেখিলাম, তারা সবাই কিছু না কিছু ব্যবসা করে। বাঙ্গালী একটিও দেখিলাম না। যার চাকরী ভিন্ন গতি নাই তার বিদেশে কি করিয়া ঠাই হইবে। ভিন্ন দেশে ভারতবাসীরা ভারতবাসী দেখিলে কতই যে আদর যত্ন করেন তা বুঝান যায় না। সেটি সকল দেশেরই স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি। তাঁহারা আমাকে বিশেষ যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া ও পরামর্শ দিয়া সেই আপিসেরই একটী ইংরেজী জানা ফরাসী যুবককে আমার সহিত দেশ দেখাইয়া লইয়া বেড়াইতে পাঠাইয়াছিলেন। সেই স্থানেই মোট ঘাট রাখিয়া আমরা আর একখানি টেকসীমিটার ভাড়া করিয়া সহর দেখিতে বাহির হইলাম।

সে যুবকটির ১৮ বৎসর মাত্র বয়স। আজ দুই বৎসর হইল, পড়া

বাবাও আছেন মাও আছেন ও তাঁহারা অশক্তও নহেন, তবে তিনি নিজেই কাহারও গলগ্রহ হইতে চাহেন না। তাই স্কুল হইতে বাহির হইয়াই বিলাতের এক ইঙ্গরেজসওদাগরের কাছে কাজ শিখিতে লাগিলেন। তবে উদ্দেশ্য ব্যবসাও শিখা আবার ইংরাজী ভাষাও শিক্ষা। ইংরেজের দেশে যাইয়া ও সে দেশের লোকের কাছে থাকিয়া যেরূপ সহজে ও ভালরূপে সেই দেশের ভাষার আয়ত্ব হয় বই পড়িয়া তেমন হয় না। আর তা ছাড়া ইংরাজের মত এত বড় ব্যবস্থাদার আর নাই। ব্যবসা কার্য্যে থাকিতে হইলে তাদের ভাষা না শিখিলেই চলে না। এই কারণে ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের শত শত যুবক এইরূপ কাজ লওয়া উপলক্ষ করিয়া ইংলণ্ডে কিছুদিন থাকিয়া ইংরাজী ভাষা শিখিয়া আসেন। জার্ম্মাণী প্রভৃতি কত জাতি এইরূপ করিয়া অনেক বিষয়ে ইংরাজকে ব্যবসা হইতে হটাইয়াছে। সেই কারণে এখন এইরূপ জার্ম্মাণ প্রভৃতি বিদেশী কেরাণী লওয়া সম্বন্ধে ইংরাজের বড় আপত্তি দাঁড়াইয়াছে। সে এত প্রবল আপত্তি যে হয় ইহা কতক পরিমাণে বারণ করিতে আইনই বা পাশ হয়।

সে লোকটির নাম "ডুবে"। ফরাসী ভাষার কোমল সুমধুর সুরে এ নামটি বড়ই সুন্দর শুনায়। সে লোকটি সপ্তাহে ৩৫ ফ্রাঙ্ক মাহিয়ানা পায়। তার থাকিতে খরচ হয় ১৮ ফ্রাঙ্ক ও চুরট আদি বাজে খরচে আরও তিন চার ফ্রাঙ্ক লাগে। মা-বাপকে কিছু দেয় না। তার এক পিসীর মেয়ে আছে, তার সঙ্গে রোজ সন্ধ্যার পর "বুলিভার্ডে" বেড়াইতে যায়। অনেক রাত্রি অবধি একত্র বেড়ায়। কখনও কখনও একত্র ডিনার খায় ও থিয়েটারে যায়। সেই জন্য বড় হাতে কিছু থাকে না। এমন স্বাধীন সরল ভাব যে আমার কোনও কথাই তাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল না সব আপনিই বলিল। আমি বলিলাম, "আচ্ছা মনসিও ডুবে ঠিক

কথা কও।” বল্লে সকল বিষয়েরই কথা কই। আজ কাল যে “টুরণামেণ্ট হচ্চে সে সম্বন্ধে, ও যে জুয়াখেলা হচ্চে তার সম্বন্ধে, ও থিয়েটার সম্বন্ধে। প্রণয় করার কথা কিছুই বল্লে না।

প্রতিদিন একজন সমবয়স্কা যুবতীর সঙ্গে একত্র বাগানে বেড়াতে যায়, আর অনেক রাত্রি অবধি একত্র থাকে, ও একত্র ভোজন করে ও একত্র থিয়েটারে যায় অথচ প্রণয়ের কথা কিছুই কবুল করে না, একথা ভেবে আমার বড়ই আশ্চর্য্য মনে হলো। আমি না থাকতে পেরে তাকে স্পষ্টই সে কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সে অতি সরল ভাবে এই বলিয়া উত্তর দিল, “আমার তাঁকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা আছে—তিনি যদি রাজি থাকেন বিবাহ করিব; কিন্তু এখনও কোনও ভালবাসার কথা বলি নাই।” ও উত্তর সকলের বিশ্বাস হোক না হোক আমার তার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। স্বাধীনতার দেশে “ঢাক ঢাক” বা লুকোচুরি নাই। যে যা করে তা অকারণ অকবুল করে না। বিরক্ত হইয়া প্রশ্নের প্রতিবাদ করে কিন্তু এখনও—মিথ্যা উত্তর দেয় না। আমি যেমন সমাজে শিক্ষিত তাই আমার এই সন্দেহ হইয়াছিল। যারা এইরূপ ভাবে অহরহ মিশিতেছে তাদের অন্ত। আমাদের বাল্য শিক্ষার দোষেই আমাদের অনেকটা অমনি সন্দিগ্ধ ও মলিন মন।

তার পর আপনিই জিজ্ঞাসা করিল “ডাক্তার, আপনি কি বলতে পারেন First cousin বা পিশাত ভগ্নীর সঙ্গে বিবাহ হলে কি সে বিবাহে সন্তানদের উপর কোনও দোষ অর্শায়—কেহ কেহ বলে তা ভাল নয়।” আমি যে কি তার উত্তর দিব ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। দুধারেই কথা আছে—বলিতে গেলে অনেক বুঝাইতে হয়। তাই আমার মতের শুধু সারাংশ টুকু বলিলাম—“যাঁর সহিত অন্তরের ভালবাসা হয়—তাঁকে বিবাহ করিলে কোনও অনিষ্টই হওয়া সম্ভবপর নহে। সেইরূপ বন্ধনেই পৃথিবীর যত প্রাতঃস্মরণীয় বিখ্যাত লোক জন্মিয়াছেন। সেইটিই

অভিব্যক্তির শ্রেষ্ঠতম অবস্থা—"Natural Selection" বা উপযুক্ত বাছিয়া লওয়ারই চরম উৎকর্ষ।"

মনের মত কথা শুনিলে যেমন সকল মানুষেরই মুখে একটা আনন্দের ভাব হয়—তাহারও মুখে সেইরূপ ভাব প্রকাশ পাইল। কিশোর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনেও তরুণ ভাব আসিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু স্বাধীনতা ও সুশিক্ষার গুণে এখনও কোন নিয়ম অতিক্রম করে নাই।

প্যারী নগরে এতগুলি প্রসিদ্ধ স্থান দেখিবার আছে যে, এক প্রবন্ধে সে সকলের কথা বলা যায় না। তার প্রধান কারণ, সে সকলগুলি এত সুন্দর ও এত ঐতিহাসিক ঘটনাবলিতে পরিপুর্ণ। শেষোক্ত হিসাবে এমন প্রসিদ্ধ সহর পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানে নাই। সমগ্র ইউরোপের কেন, আরও দূরস্থ পৃথিবীর অপর দেশেরও ইতিহাস এই ছোট নগরটির ভিতর কতক পরিমাণে সংরক্ষিত আছে। ফরাসীজাতি বড়ই সৌন্দর্য্যপ্রিয়। তাঁহাদের সকল বিষয়ই সৌন্দর্য্য মাখান। মিষ্ট নরম ভাষাটি যেমন সুন্দর, রান্না বাড়াও তদ্রূপ। আর বেশ-বিন্যাসের তো কথাই নাই। ফরাসীই সভ্য জগতের ফ্যাসানের নেতা। তাঁহাদের পথ অনুসরণ করিয়া অন্যান্য দেশের ফ্যাসান নিরূপিত হয়। বিলাতের পোষাকের দোকানে দোকানে লেখা আছে—"নূতন প্যারিসের ফ্যাসানে নির্ম্মিত।" লণ্ডন সহরেও অনেক ভাল ভাল হোটেল ফরাসী দ্বারাই পরিচালিত। আর অসংখ্য নাট্যশালাতেও ফরাসী নাচ গানই প্রচলিত। তেমনি এই প্যারী সহরটির প্রধান প্রধান দেখিবার স্থানগুলিও অতি পরিপাটী ভাবে গঠিত।

আমি প্রথমে এইখানে এই সকল স্থানের অল্প কথায় বর্ণনা করি। এই সকল স্থানের সে দেশের ইতিহাসের সহিত সম্বন্ধ পরে বলিব। ফরাসীদেশের ইতিহাস আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই সে কথা বলা যাইবে।

এক একটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চারি পাঁচ তালা বাড়ী। হাওয়া ও আলো খেলিবে বলিয়া অন্তর অন্তর করিয়া অংশগুলি গড়া। মুক্ত স্থানে ও জানালার আলসিতে সুন্দর সুন্দর ফুলের টব। তাতে ঠিক এক সমান সব বাড়ীগুলি অতি সুন্দর দেখাইতেছে। সৈন্যরাও সব এদিক্ ওদিক্ করিয়া বেড়াইতেছিল। তারা দেখিতে বলিষ্ঠও নয়, গম্ভীর বা সাহসিকও নয়। অমন ঘিঞ্জি সহরের মাঝে, চারিতালা বাড়ীতে, খোস পোষাকে থাকিলে কে না দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

তার অনতিদূরেই Republic "রিপাবলিক্" বা ফরাসী দেশের সাধারণ তন্ত্রের ছবি। ফরাসীরা সাধারণ তন্ত্র প্রাণের সহিত ভালবাসে। যখন নেপোলিয়ন সাধারণ তন্ত্র ঘুচাইয়া নিজেই সম্রাট হইয়া বসিয়াছিলেন, তখন এসব গৌরবের দিনেও অনেক লোকের তাহাতে দারুণ আপত্তি ছিল। আবার যখন (Franco Prussian War) জর্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধে ফরাসী জাতির হার হইল, তখন তাহাদের রাজাকে তাড়াইয়া আবার ফরাসীরা সাধারণ তন্ত্র পুনরায় স্থাপিত করিল। এইটি সেই শুভদিনের স্মৃতিস্তম্ভ। এই পীঠস্থানে উপাসনা হয়। একটি উচ্চ থামের উপর একটি রমণীমূর্ত্তি স্থাপিত, তাঁহার হাতে "অলিভ" গাছের পাতা। এই পাতাগুলি পুরাতন গ্রীসে বিজয়ী বীরের মাথায় মুকুটের উপকরণ ছিল। অক্ষয় যশের মত ঐ পাতাগুলি শুকাইলেও তার সবুজ রং একেবারে যায় না। আর এক সূচনা, শান্তি স্থাপনের চিহ্নস্বরূপ। যথায় যুদ্ধবিগ্রহের আগমন সে গোলমালে অমন সুন্দর সুকোমল গাছ জন্মায় না। তাই তাদের আবির্ভাবই শান্তিসূচক হইয়াছে। আর যে বরেণ্যা রমণীমূর্ত্তির হাতে সেই পাতাগুলি দেওয়া হয়েচে, তাঁহারাই ত ধরাধামে শান্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যেখানে সৌন্দর্য্য সরলতা শান্তি ও পবিত্রতার নাম গন্ধও আছে, সেইখানেই তাঁহাদের কথা সকল দেশের লোকেরই আগে মনে আসে।

এখান হইতে কিছুদূর যাইলেই "আর্ক ডি ট্রায়াম্ফ" নামক একটি

বৃহৎ সুন্দর তোরণ গাথা এইটি দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের বিজয় ঘোষণা করিতেছে। অতি চমৎকার কারুকার্য্য করা সেই বৃহৎ প্রস্তরের তোরণটি আজও সেখানে সেইরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। উহা দেখিলে দুইশত বাইশটি যুদ্ধের সব কাহিনীই মনে আসে। সে সব নামগুলি প্রস্তরের গায়ে গায়ে খোদা আছে।

তার খানিক দূরেই কাল স্তম্ভের মত একটি স্তম্ভ উর্দ্ধে মাথা তুলিয়া বিদ্যমান, এইটি নেপোলিয়ন যত যুদ্ধে জয় করিয়া কামান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেইগুলি গালাইয়া তার ধাতু দিয়া গঠিত। আমাদের দেশে একটি রণদেবী যেমন গলায় মুণ্ডমালা পরাতে ভীষণ দেখান নেপোলিয়নেরও এ সকল স্মৃতিচিহ্নও তেমনি ভীষণ হইয়াছে।

আরও কিছুদূর যাইলে "নটার ড্যাম ডি প্যারিস" নামক গির্জ্জার চূড়া দেখা যায়। সেটি একটি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর গির্জ্জা। ফরাসী রাজ্যের প্রধান উপাসনার স্থান। দুইদিকে দুটি মন্দিরের চূড়ার মাঝে সেই সুন্দর বাড়ীটি দাঁড়াইয়া আছে। নক্সা ও কারুকার্য্যে ভিতর ও বাহির ভরা। নানা রঙের কাঁচের বড় বড় জানালাগুলি কতই বর্ণ দেখাইতেছে। তার ভিতরকার গম্বুজের ভিতর—স্তোত্রগানের মধুর স্বরগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বার বার প্রতিধ্বনিত হয়। যেন সঙ্গীত শেষ হইলেও তার স্নিগ্ধ স্মৃতি ফুরাইয়াও ফুরায় না।

ইহার নিকটবর্ত্তী একটি দোকানে সুন্দর সুন্দর মোম-নির্ম্মিত ছাঁচ দেখিলাম। হৃদয় মস্তিষ্ক জরায়ু প্রভৃতি মোমে গড়া শারীরিক যন্ত্রগুলি জানালায় সাজান রহিয়াছে। তার প্রতিটি খণ্ড খণ্ড করিয়া খোলা যায় ও কিরূপে জরায়ুর মধ্যে সন্তান বর্দ্ধিত হইতেছে ইত্যাদি ঘটনা তার ভিতর স্বচক্ষে দেখা যায়। পাকস্থলীতে খাদ্যের বিভিন্ন পরিবর্ত্তন অমনি ভাবে দেখান। এগুলি বড়ই বিস্ময়কর ও উপকারী শিক্ষা; সকল লোকেরই ইহা দেখা উচিত।

এখান হইতে কিছুদূরে গিয়া প্যারী নগরের পুলিশের "মর্গ"। সেখানে যত অপঘাত মৃত্যুতে মৃত লোকদের মৃত দেহ খুলিয়া সারি সারি সাজাইয়া রাখা হয়। পথের লোকেরা দেখিয়া যাহাতে চিনিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে। সেই মৃতদেহগুলি এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ভাল খাটে সাজাইয়া রাখে, যে, তাহাতে বীভৎস ভাব অনেকটা কমিয়া যায়। একটি ছোট ছেলে তথায় শায়িত রহিয়াছে দেখিলাম—সে "সীন্" নদীর জলে ডুবিয়া মারা যায়। তার হাতের নখে এখনও মাটী লাগিয়া রহিয়াছে। যখন প্রাণবায়ু নিশ্বাসপ্রশ্বাসের রোধে বাহির হইতেছিল, তখন মাটী হাতে পাইয়া জীবন বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছে, উহা তারই দাগ। তার পাশেই একটি বৃদ্ধ—তার এক দিকে মুখ ও মাথা বিষমরূপে আহত হইয়াছে, কিসে তা জানি না। মাথার ঘী অবধি বাহির হইয়া গিয়াছে। তার পরে একটি অতি অল্পবয়স্ক শিশু ফুল,—ফুটিয়াই মুদিত হইয়াছে। রাস্তার ধারে একটি ক্যাম্বিসের বেগের মধ্যে তার দেহ পাওয়া যায়। নিশ্চয়ই কোনও অভাগিনীর কলঙ্ক ঢাকিবার জন্য এই কাজ হইয়াছে। তার পাশেই একটি ক্ষীণদেহা রমণীমূর্ত্তি। তাঁহারও ইতিবৃত্ত কিছুই জানা নাই। সমস্ত অঙ্গের কোথাও একটু আঘাতের রেখাও দেখিলাম না। কাল চুলের খোপাটি অসংযত ভাবে থাকাতে ঘাড়টি বাঁকা। অবিস্ফারিত স্থির চোখ দুটি মৃত অবস্থাতেও অতিশয় স্বচ্ছ। মুখের ভাব বিরক্তিমাখা —যেন কার উপরে অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এইখানে আমার অনেকক্ষণ দেরী হইল। গাইড বার বার "এসো এসো" বলিলেও আমার পা আর সরে না।

এখান হইতে কিছুদূরে যাইলেই "প্যালে ডি জাসটিস" অর্থাৎ দোষীর বিচারের স্থান দেখা যায়। এত বড় বাড়ী বটে কিন্তু দোষীর কি কোথাও সুবিচার হয়?

এখান হইতে কিছুক্ষণ যাইলেই প্যারী নগরের বিখ্যাত রাস্তা

"রুস্তীটিভলী"।—এটি বড় প্রশস্ত রাস্তা ও যত ভাল ভাল দোকান হোটেল বাগান ও বাড়ী এই রাস্তার উপরই অধিষ্ঠিত। এইখানেই একটি হোটেলে আহার করিলাম। সুস্বাদু মাংস ডিম ও মাছের সঙ্গে আমাদের মত শাক চড়চড়ি ও ডালও রাঁধে। উপরে ছবির দোকানে গিয়া অনেকগুলি ছবি ছাপা পোষ্টকার্ড কিনিলাম। সে ছবিগুলি "লুভেয়ারের" ও "লকৃসেমবর্গের" মিউসিয়মের চিত্রশালার ছবি। সে গুলি বিলাতী ছবি-ছাপা পোষ্টকার্ড হইতেও সুন্দর ও দামও বেশী। এত সুন্দর হইলেও সে ছবিগুলি এখানে ছাপাইতে পারিলাম না—লোকে অশ্লীল বলিবে।

এই রাস্তার নিকটেই "লুভেয়র"এর আর্টগ্যালারী ও "বুলিভার্ড" বা বিখ্যাত বাগান বা রাজ-প্রাসাদ ও প্রেসিডেন্টের প্যালেস আছে। ও অনতিদূরে প্যানথিয়ন্ ও ফরাসীদেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারকর্ত্রী (John D' Arc) কুমারী জনডার্কের প্রতিমূর্ত্তি আছে। কিন্তু সে সব বিষয়ক মধুর কথা সবিস্তারে পরে বলিব।

"ব্যাসটাইল"টি একটি বাড়ী ও উদ্যান উভয়ই বলা যাইতে পারে। ইহার সহিত সংসৃষ্ট ফরাসীবিদ্রোহের অনেক ইতিহাস আছে। প্রথমে রাজ-ভবনের মত করিয়া এটি গঠিত হয়, পরে চারি পাশে উচু পাঁচীর উঠাইয়া এটি একটি কেল্লার মত হইয়া গেল। ভিতরে সুন্দর বাগানে "এলেম গাছের" তলার ঘন ছায়ায়, তার পর অনেক দিন ধরিয়া রাজ্যের বিচার হইত। পরিশেষে এটি রাজবিদ্রোহীদের জেলখানা রূপে পরিণত হইত। পরে ফরাসীবিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা এটিতেই প্রথম প্রবেশ করিয়া জেল হইতে কয়েদী খালাস করিয়া দিয়া এটি কতক ভাঙ্গিয়া দেয়। এই বাগানওয়ালা বাড়ীটির ভাগ্যচক্র এতবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। লণ্ডন টাউয়ারের (London Tower) প্রসিদ্ধ জেলখানা "বোকাম্প টাউয়ার (Bauchamp Tower) এর অন্ধকারময় ছোট ঘরের সঙ্গে

প্যারী নগরের "প্যানথিয়নে" যত যশস্বী ও বড়লোকের গোরস্থান। সেটি অনেকটা লণ্ডনের "ওয়েষ্ট মিনিষ্টর আবির" মত। কত শত ফরাসী দেশহিতৈষী ও কর্ম্মবীরগণ একত্র এই স্থানে শুইয়া এখন নির্জ্জনে অনন্ত-নিদ্রায় ঘুমাইতেছেন। সে স্থানটি দেখিলে আপনা আপনি ভক্তিভরে মাথা নিচু হইয়া পড়ে। মনে হয় যেন কোন তীর্থস্থানে আসিলাম।

যেমন দেশটি সুন্দর ও জাতিগত মনের ভাব সরল স্বাধীন সৌন্দর্য্য-জ্ঞানপ্রিয় ও আনন্দময়, তেমনি সে দেশের রাজবাড়ীটিও অতি পরিপাটী করিয়া নির্ম্মিত ও সজ্জিত। সেটির চারিদিকে প্রকাণ্ড বাগানযুক্ত কম্পাউণ্ড রেলিং দিয়া ঘেরা আছে। তার ভিতর নানারূপ ফুল ও ফলের গাছের কেওয়ারী করা অংশ আছে। তার মাঝের পথগুলি রঙ্গিন্ চক্‌চকে পাথর দিয়া বাঁধান। মাঝে মাঝে ঘসা কাচের ছাদ উঠান এক একটি ছাউনি আছে। তার নীচে বেঞ্চীপাড়া। এই স্থানে প্রণয়ীরা একত্র বসিয়া চুপি চুপি অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা কন। আর সহরের ও বাহিরের যত সৌখীন লোক সকাল সন্ধ্যায় বেড়াইতে আসেন। নানা স্থানে নানারূপ সঙ্গীত বাজে। তারই একটি অংশে মিশর দেশের কতকগুলি সুন্দর সুন্দর প্রস্তর স্তম্ভ আছে, তার গায়ে হাইরোগ্লিফিক্ অক্ষরে লেখা বিদ্যমান। চারিদিকে ফরাসী দেশের বিখ্যাত লোকের ছবি। ও এক স্থানে একটি রমণী মূর্ত্তি মাটিতে বসিয়া মাথা হেঁট করিয়া কাঁদিতেছেন। জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধে হারাতে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যে, "আলসাস্" ও "লোরেন্" নামক দুটি দেশ জার্ম্মণীকে দিতে হয়, সেই অঙ্গচ্ছেদের ব্যথাতেই জননী ফরাসী ভূমি কাঁদচেন—ঠিক যেন সমান অবস্থাপন্ন আমাদের বঙ্গভূমিরই মত।

সে স্থান হইতে লুভেবারের আর্টগ্যালারী বেড়াইতে গেলাম। সে স্থানে আগে যাই নাই। তার কারণ সেখানে কত কি অতি সুন্দর সুন্দর

লাগিবে। সে অতি প্রকাণ্ড স্থান বৃহৎ কারুকার্য্য করা প্রাচীর দিয়া তার চারি পাশ ঘেরা। তার ভিতর বেড়াইবার বাগান। রাস্তা দিয়া কত লোক বা যাত্রী গাড়ী উপর নীচে ঠাসা লোক বোঝাই লইয়া চলিয়াছে। প্রাঙ্গনেও কত সুন্দর সুন্দর ছবি আছে, তার মধ্যে একটি সর্ব্বপ্রধান—"গামবাটার" ছবি। তার চারিপাশে কতকগুলি আফরিকার কৃষ্টবর্ণা রমণী ও ছোট ছেলের নগ্ন মুর্ত্তি রক্ষিত আছে।

মাঝখানে সেই লুভেবারের আর্ট গ্যালারীর বড় বাড়ীটি বিদ্যমান। তিন তলা উঁচু ও অতিশয় কারুকার্য্য করা ঢালু ছাতওয়ালা প্রকাণ্ড বাড়ী। দূর হইতে কতই সুন্দর দেখায়।

এত বড় স্থানের সম্যক বর্ণনা এস্থানে হওয়ার সম্ভাবনা নাই—কারণ সেই বৃহত্তম আর্ট গ্যালারী ও স্থপতিবিদ্যালয়ে কতই না জানি দেখিবার ও বলিবার বিষয় আছে। এই সকল ছবির ও প্রস্তরমূর্ত্তির বর্ণনা আমি স্থানান্তরে করিব। এখন এখানে সংক্ষেপে দু এক কথা বলি।

সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াই নীচের তলায় সুন্দর সুন্দর প্রস্তরমুর্ত্তি ও অন্যান্য উপকরণে গঠিত নানা বিষয়ের জিনিষ আছে। সে ছবিগুলির অঙ্গসৌষ্ঠব এমন সুন্দর যে, দেখিলে মনে হয়—প্রকৃতির জীবন্ত পুতুল হইতেও অধিক সৌন্দর্য্য মাখা। কি গড়া কি আঁকা এ সব দেশে প্রায় সব রমণীমুর্ত্তিগুলি উলঙ্গ। ইটালীর আর্টের এই দস্তর। সব নরদেহগুলি মাংসবহুল ও বীরের মত বলবান্। সবাই এক একটি আয়াসসাধ্য কার্য্যে রত। কেহবা বর্ষা ছুড়িতেছেন কেহবা মুগ্ধ হইয়া একটি রমণীকে উঠাইয়া লইয়া পলাইতেছেন ইত্যাদি হরেকরকম ভাবশুদ্ধ ছবি। বীর দেহের পাশে ক্ষীণ সুগঠন রমণীমুর্ত্তি কি পরিস্ফুট হয়। অঙ্গভঙ্গিগুলি কি জীবন্ত ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এমন কখনও কোথাও দেখি নাই—ইহজন্মে সে সব দৃশ্য ও ভুলিব না।

দরজা হইতে ইংরাজীতে লেখা একখানি গাইড বই বার আনা মূল্যে

ফিনিয়া উপরে গেলাম। সেথানে গিয়া দেখি,—দেখিবার অসংখ্য অনন্ত জিনিষ আছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের, ভিন্ন ভিন্ন দেশের, নানা চিত্রকরের দ্বারা অঙ্কিত—অনেক রকমের চিত্রগুলি সব—"আকাশ আলোর" নীচের সুব্যবস্থায় টাঙ্গান আছে। তার প্রত্যেকটির সৌন্দর্য্যে এত বিষয় দেখিবার আছে যে, নির্নিমেষ হইয়া দেখিতে হয়। তার মধ্যে একটি ছবি আমি অন্য কোথাও দেখি নাই, কেবল সেখানেই দেখিলাম। সেটীতে ট্রয়রাজপুত্র "প্যারিস", গ্রীকরাজপত্নী 'হেলেন্'কে এক নির্জ্জনকক্ষে বীণা বাজাইয়া শুনাইতেছেন। বীণার মধুর ঝঙ্কারে একান্ত মুগ্ধ হইয়া হেলেন যখন প্যারিসের নিকটে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়াছেন—সেই অবস্থা চিত্রিত। এখানে আর কত বলিব, আসিবার সময় সঙ্গে করিয়া একখানি পুস্তক আনিয়াছি, সেখানিতে আরও চিত্রাগারের ১৬০ খানি ছবির নকল আছে। নির্জ্জনে থাকিলে এক একবার সেই ছবিগুলি দেখি। আর ৬ হাজার মাইল দূরের সেই সুন্দর চিত্রশালাটির চিন্তায় মন কোন এক অজানা রাজ্যে ভাসিয়া যায়।

প্যারিস নগর।

এ প্রবন্ধে ফরাসীদেশের ইদানীকার ইতিহাস বলিব। যেমন রামায়ণ মহাভারতের মধুর কথা শ্রোতব্য বিষয়, এ দেশের ইতিহাসও সেইরূপ। বলিতে কি পৃথিবীর আধুনিক কোনও স্থানের ইতিহাস এমন মধুর ও উপদেশপূর্ণ নহে। জাতীয় ইতিহাস বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভ হইতেই ঘটনাপূর্ণ। তাঁহারাও আর্য্য জাতির একশ্রেণীর লোক "গেলিক" জাতীয়। ইঁহারা বহুপূর্ব্বে পুরাতন মাতৃভুমি এসিয়াখণ্ড হইতেই উত্তরপশ্চিম অভিমুখে যাইয়া এই দেশে অবস্থিতি করেন। রোমরাজ্যের বিধ্বংস ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের হাতেই সংঘটিত হয়। জুলিয়স্ সীজার গল জয় করিবার পর প্রায় চারিশত বৎসর এই দেশ রোমানদের পদতলে ছিল। পরে ইঁহারাই মহা প্রতাপান্বিত হইয়া রোমরাজ্য ধ্বংস করেন। কালের কি বিচিত্র গতি। ব্রিটনে ড্রুইদ, রাণী বডেসিয়ার (Boadacea) উপর রোমান সৈন্যাধ্যক্ষদের অমানুষিক অত্যাচার দেখিয়া শাপ দিয়াছিলেন।

"Hark the Gaul is at her gate"

"ওই শুন, তাদের শত্রু "গল"দেশের লোকেরা তাদেরই রাজ্যে (জেতা হইয়া) প্রবেশ করিতেছে।" কালে কি ঠিক তাহাই ঘটিল!

আবার যখন চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা ধর্ম্মোন্মত্ত হইয়া হৈ হৈ শব্দে আসিয়া উত্তর আফ্রিকা এমন কি দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপও জয় করিয়া লইলেন। যখন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের পীঠস্থান জেরুসুলেম নগর তাঁহাদের করতলগত হইল। তখন পুণ্যভূমিকে বিধর্ম্মীদের হাত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য ইউরোপে যে বিষম ধর্ম্মযুদ্ধ "ক্রুসেদ" হয়, সেই আন্দোলনের গোড়ায় ছিলেন—সন্ন্যাসী "পিটার" Peter the Hermit তিনিও এই স্থানের লোক। তিনি অতি খর্ব্বাকৃতি দুর্ব্বল পুরুষ ছিলেন। যখন

ইউরোপের রাজ্যে রাজ্যে ওজস্বিনী ভাষায় ধর্ম্মযুদ্ধ প্রচার করিয়া বেড়াইলেন, রাজা হইতে গরীব প্রজা অবধি সকলেই উন্মত্ত হইয়া সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া সেই যুদ্ধে ছুটিল। সে এমন ভয়ানক যুদ্ধ, তাতে এত অধিক সৈন্য সমাবেশ হইয়াছিল যে, পারস্যরাজ ডেরায়সের গ্রীস আক্রমণের পর হইতে আর কখনও তেমন হয় নাই।

এই দেশ হইতেই নরম্যাণ্ডির ডিউক উইলিয়ম ইংলণ্ড জয় করিয়া খৃষ্টের একাদশ শতাব্দীতে সেখানে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরই বংশধরেরা এখন ইংলণ্ডের রাজা। সে ডিউক নিজে একজন জেলেনীর ছেলে, তাই বোধ হয় অমন বলবান্ ও প্রতাপশালী ছিলেন। আর ইংলণ্ড জয় করার পর কত বৎসর ধরিয়া তাঁহারা বিজিত ইংরাজদের সহিত এমন দুর্ব্ব্যবহার করিতেন যে, সে কথা মুখে আনা যায় না। এই সময়কার ইতিহাসে লেখা আছে,যে—নর্ম্মান ব্যারনরা নিয়ম করিয়াছিলেন তাঁহাদের এলাকার কোনও ইংরাজকে বিবাহ করিয়াই প্রথম তিন দিন তার নবপরিণীতা বধূকে নর্ম্মানদের ঘরে রাখিতে হইবে। তার উদ্দেশ্য যে সকল ঘরেই যেন নর্ম্মান্ ঔরসজাত অন্তত এক একটি ছেলে জন্মায়।

পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংরেজদের সঙ্গে ইহাদের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ একশত বৎসর ধরিয়া চলে বলিয়া ইহাকেই Hundred Year's War বা শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ বলে। যুদ্ধে জয় পরাজয় তো আছেই। তবে "ক্রেশীর" যুদ্ধে ও "এজিনকোটের"যুদ্ধে বারবার হারিয়া ফরাসী দেশের এমন অবস্থা হইল যে, আর রাজ্য থাকে না। তখন দেশের প্রায় অধিকাংশই ইংরাজের হস্তগত। বিপদ্ তো একা আসে না। ঠিক এই বিপদের সময়েই ফরাসী দেশের বৃদ্ধ রাজা মারা গেলেন। তাঁর পুত্র "ডফিনের" তখন অল্প বয়স। গোলমালের আর সীমা রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল ঘুস খাইয়া বিস্তর ঘরাও শত্রুও দাঁড়াইতে লাগিল। রাজ্য আর টিকে না—এমন সময়ে এক অসম্ভব ঘটনা ঘটিল।

"লোরেনের" একটি ছোট পল্লিগ্রামের এক কৃষক বালিকা প্রত্যহ মেষ চরাইতে যান, আর সেই জনহীন প্রান্তরে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবেন। বহুদিনকার একটি প্রবাদ ছিল যে—"এক কুমারী হইতেই ফরাসী দেশ উদ্ধার হইবে।" লোকের মুখে তিনি নিজ দেশের দুর্দ্দশার কথা শুনিতেন ও অহোরাত্র সেই সকল কথাই ভাবিতেন। ক্রমে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, অন্তরীক্ষে যেন এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি আসিয়া তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আদেশ করিতেছে। সেই জাগ্রৎ স্বপ্ন সেই গম্ভীর প্রত্যাদেশ দিন রাত তাঁর কানে ধ্বনিত হইতে লাগিল। হৃদয়ের আবেগ আর নিরুদ্ধ রাখিতে না পারিয়া তিনি পিতাকে বলিলেন, পাড়াপর্শী লোকদের বলিলেন, সবাই তাঁহার কথা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিল।

মেয়েটির নাম "জিনি"। তাঁর অষ্টাদশ বৎসর বয়স। কুমারীর মনে কখনও কোনও পাপ চিন্তা উদয় হয় নাই। কি এক দিব্য শক্তি তাঁর মনে আসিয়া তাঁহাকে দুর্দ্ধর্ষ করিয়া তুলিল। তাহাতে তাঁহার পিতা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে রাজ সকাশে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

সমস্ত পল্লিটি খুঁজিয়া একটি পুরাতন বর্ম্ম মিলিল। শিরস্ত্রাণ আর এক জনের নিকট পাওয়া গেল। অসি ও বর্শা আর একজনের। এইরূপ ভাবে সজ্জিত হইয়া বালিকা রাজদর্শনে চলিলেন। রাজার সহিত সাক্ষাতের পথে রাজ-কর্ম্মচারীরা কত বাধা দিল। পথে কত লোক হাসিল, কত লোক বিদ্রূপ করিল। কিন্তু কৃষকবালার বর্ম্মপরা সেই অমানুষিক মূর্ত্তি দেখিয়া কাহারও সে ভাব অনেকক্ষণ থাকে নাই। এক বৈদ্যুতিক শক্তির ভীষণ ভাব সকলের মনকেই স্তম্ভিত করিয়া রাখিল।

রাজ সভায় প্রবিষ্ট হইয়াই বালিকা আপনিই রাজসকাশে গিয়া রাজাকে যথাযথ অভিবাদন করিলেন। কেহই দেখাইয়া দেয় নাই, কেহ শিখায়

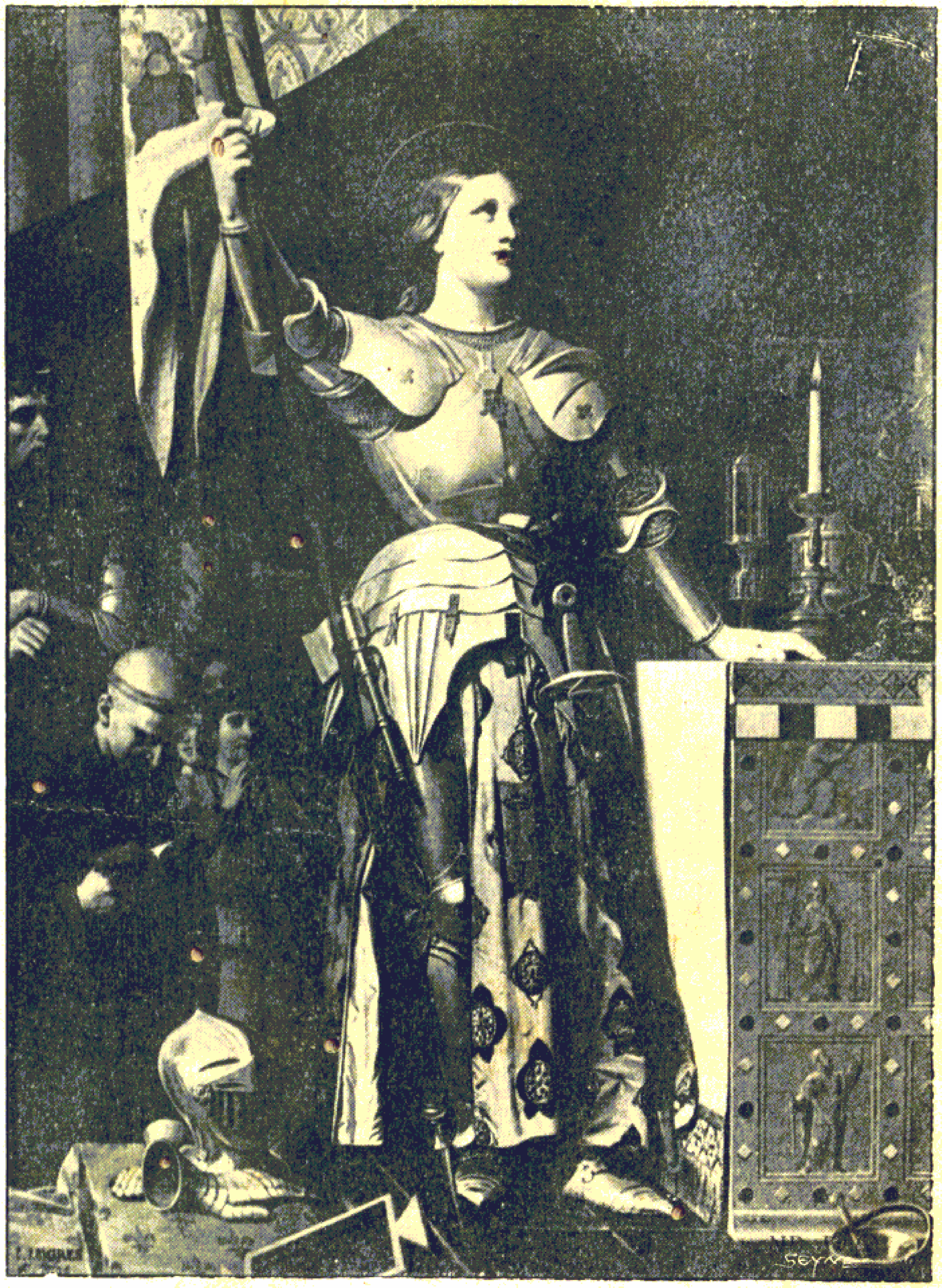
অভ্যর্থনা করিলেন। সকলের মনেই এক অপূর্ব্ব আশার সঞ্চার হইল। সৈন্যদলের অধিপতি হইয়া বালিকা অবরুদ্ধ "অরলিয়নস্" নগরে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাঁহার উৎসাহ ও উত্তেজনায় যাবতীয় সৈনিকদের মন আশা উৎসাহে ও আনন্দে ভরিয়া গেল।

নূতন উল্লাসের সে দুর্দ্ধর্ষ বেগের কাছে দাঁড়ায় কে। পলে পলে ইংরাজসেনা বিধ্বস্ত ও স্থানভ্রষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে অবরোধ তুলিতে হইল। তখন বিপুল জয়োল্লাসে ফরাসী সেনা সেই নগরে প্রবেশ করিয়া অচিরে রাজকুমারকে "রীমাস্" নগরে রাজ্যাভিষিক্ত করিল। এর পর হইতে সর্ব্বত্রই সৌভাগ্য। ফরাসী সেনা যেখানে যায় সেইখানেই বিজয়ী। শেষে এমন অবস্থা হইল যে, ইংরাজের "ক্যালে" বন্দর ছাড়া ফরাসীদেশের ভূমিখণ্ডে আর কোনও স্থান রহিল না।

কিন্তু এরূপ শক্তি বেশী দিন স্থায়ী হয় না। এরূপ আশার অতীত সৌভাগ্যও দীর্ঘকাল রহে না। বিদ্যুতের মত সকল ঘটনা ঘটিয়া আবার বিদ্যুতের মতই নিভিয়া গেল।

শেষ যুদ্ধেতে বীরবালা নিজ দেশের লোকের ষড়যন্ত্রতেই ইংরাজের হাতে ধরা পড়িলেন। যাঁর জন্য তাহাদের এত অনিষ্ট, সে লোকের প্রতি লোকে যে কিরূপ ব্যবহার করিবে, তা আর বলিবার আবশ্যক নাই। অবশেষে এই অপবাদ দেওয়া হইল যে তিনি "ডাইনি"। সে কথা তখন লোকে বড়ই বিশ্বাস করিত। ও সেরূপ গুরুতর সন্দেহের এক বিধান জীবন্ত অবস্থায় আগুনে পুড়াইয়া মারা। সেইরূপ ব্যবস্থাই হইতে লাগিল। প্রশস্ত মাঠে লোহার শিকল বাঁধা একটি লোহার খুঁটি পুতিয়া তার নীচে চারিদিকে তৈলাক্ত কাঠ সাজান হইল। এমন সৎকর্ম্মের সমাধা দেখিতে চারিদিকে লোকে আর ধরে না। ভীষণ মুখসপরা হত্যারকদ্বয়ের করকবলে নীত হইয়া বন্দিনী তথায় পৌঁছিলেন।

এই স্থানের কবিগুরু সেক্সপিয়রের বর্ণনাটি বলিবার কথা। সে অমৃত



ফরাসী দেশের উদ্ধারিকা "জন্ অফ আর্কের" বর্ম্মপরা মূর্ত্তি।
প্যারী নগরের রাস্তায় স্থাপিত।

লেখনীর বর্ণনাটি যেমন সুন্দর, দুরপনের প্রতিবাসী বিদ্বেষ বিষ হিসাবে এক জনার মর্য্যাদা লাঘব করার হিসাবে সেটি তেমনি কুৎসিত। এমন নিরপেক্ষ জগতের কবিও সেকালে প্রতিবেশীর উপর বিদ্বেষ শূন্য হইতে পারিলেন না। অন্তরের ক্রোধ ও ঘৃণা ব্যক্ত করিয়া নিজেরই গৌরবহানি করিলেন। সে স্থানের বর্ণনার ভাবার্থের কথা, প্রথমে আমি নিজের ভাষাতেই বলি। পরে তাঁহারই লিখিত ছত্রগুলি যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া শুনাইব।

সেক্ষপীরের বর্ণনা অনুসারে তথায় সেই সকল ভীষণ ব্যবস্থা দেখিয়া মৃত্যুর ভয়ে একান্ত ভীতা হইয়া সেই বালিকা কত ক্রন্দন, কত কাকুতি-মিনতি, কত ওজর আপত্তি করিতে লাগিলেন। তাঁর যুদ্ধক্ষেত্রের সে সাহস যেন কোথায় গেল, এখন তিনি নীচশ্রেণীর সামান্য দোষীর মতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। কত প্রকারে সে ভীষণ মৃত্যুর হাত হইতে ত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন,—"আমি স্ত্রীলোক আমাকে মারিও না, আমার উপর দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও। "আমার পিতা মাতার কথা ভাবিয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও।" পরে যখন তাতেও দেখিলেন নিস্কৃতি হলো না, তখন মিথ্যা কথা ও অশ্লীল ওজর আপত্তি তুলিয়া শেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তা এই—"আমি গর্ভবতী, আমার শরীরে জীবন্ত সন্তান আছে, আমাকে মারিও না।"

এতেও যখন শার্দ্দূলদের মন গলিল না, তখন "আমি আমার ঈশ্বরের কাছে আমাকে অর্পণ করিলাম" বলিয়া ক্রশ খানি বুকে ধরিয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। আকাশের দিকে স্থির নেত্রে চাহিয়া দেববালা মর্ত্ত্যভূমি ছাড়িয়া গেলেন।

কবিবরের এই স্থানের বর্ণনাটি ভাল হয় নাই। ঘটনা সত্য হইলেও কবিতার খাতিরে এমন পবিত্র মধুর আত্মাকে মধুময় করিয়াই শেষ করা উচিত ছিল। নিঃসন্দেহ মানবজাতির স্বভাব-সিদ্ধ প্রতিবাসিদ্বেষ

তাঁহাকে বিচলিত করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই কারণে আমি অমর কবিবরের জন্য বড়ই দুঃখিত।

অন্যত্র অন্যরূপ বর্ণনাও শুনা যায়। তিনি অবিচলিত হইয়া নির্ব্বিকারভাবে আপনাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়া দেবলোকে চলিয়া গেলেন। সকল দর্শকই দেখিয়া স্তম্ভিত হইল।

আর একটি মত আছে, তার অনুসারে তিনি নিরাপদে কারাশৃঙ্খল হইতে পলাইয়াছিলেন। আমার প্রথম উক্তিটি ব্যতীত আর সকল গুলিই ভাল লাগে।

বলা বোধ হয় অনাবশ্যক যে ফরাসী দেশে তাঁহার আদরের সীমা নাই। তাঁহাকে তারা দেবী বলিয়া পূজা করে। সকল চিত্রালয়ে তাঁহার নানা ভাবের চিত্র আছে। অনেক বিখ্যাত চিত্রকরই তাঁহার কল্পিত দেবীমূর্ত্তি সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছে।

একস্থানে তাঁহার কৃষক বালিকা অবস্থার ছবি। "লোবেনের" প্রান্তরে দীনবেশে সরল পবিত্র মুখশ্রী লইয়া মেষ চরাইতেছেন। দৃষ্টি আকাশের দিকে, যেন তন্ময় হইয়া কি এক পবিত্র চিন্তায় মগ্ন।

আর একটি স্থানে তাঁহার বর্ম্ম পরা ছবি। কোমল অঙ্গে বর্ম্ম পরাতে কি এক মধুর দিব্যভাব আসিয়াছে। প্যারিস নগরের রাস্তায় তাঁর যে মুর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে সে এই বর্ম্ম পরা মুর্ত্তি। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া দূরে দাঁড়াইয়া সেই মুর্ত্তি মুগ্ধ হইয়া দেখিয়াছি। ওরূপ অতি পবিত্র জিনিষ দেখিলে মনে যেমন এক অপূর্ব্ব মধুর ভাব হয়, সেইরূপ ভাব স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছি ও আসিবার সময় সঙ্গে করিয়া সেই মুর্ত্তিরই একটি ছোট "ফটো" লইয়া আসিয়াছি—তা মাঝে মাঝে অবসর মত দেখি।

ফরাসী দেশের আধুনিক ইতিহাস।

ফরাসীদেশের মধ্যযুগের ইতিহাস সংক্ষেপে কতক কতক বলিয়াছি। সে অন্ধকারময় ভীষণ যুগের অবসানে যখন আধুনিক নুতন যুগের আবির্ভাব হইল, তখনকার ইতিহাস আরও মধুর, আরও শিক্ষাপূর্ণ। সেই মধ্যযুগের অবস্থা ও তার অবসানের কারণ সকল দেশের লোকেরই জানা উচিত। কারণ, সেই দিন হইতেই তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীর দুর্দ্দিন অবসান হইয়া নূতন উন্নতি, নূতন উদ্যম ফুটিয়াছে।

নূতন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বা ধর্ম্মসংস্কারক মহোদয়গণ পরদুঃখে কাতর হইয়া সেই কষ্ট নিবারণের জন্যই নূতন ব্যবস্থাস্থাপন করেন। তাঁহাদের পরবর্ত্তী লোকেরা সেইগুলিকে নিজের স্বার্থে লাগাইয়া সেইগুলিকেই অত্যাচারের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের বিকৃতিই এইরূপ ভাবে হইয়াছে। উদারনীতিগুলি সংকীর্ণ হইয়া পুরোহিত ও যাজকের স্বার্থসিদ্ধি করে। খৃষ্টের অমন প্রীতিপূর্ণ উদার ধর্ম্ম প্রচারের পর খৃষ্টধর্ম্মও এইরূপ হইয়া পড়িতেছিল। আমাদের দেশেও এইরূপ হইয়াছে। ও সকল দেশেই ঘটে। পাদরীদের তখন বড়ই বৃদ্ধি, বড়ই অত্যাচার ছিল। বাইবেল বিরুদ্ধ কোন কথাই সত্য হইতে পারে না, এই তখনকার ধারণা ছিল। তাঁহারা নিজেরা ছাড়া বাইবেলও আর কেহই পড়িতে পাইত না। দর্শন ও বিজ্ঞানের সত্য মুখ ফুটিয়া বলিলে সে লোকের উপর তাঁহাদের অত্যাচারের আর সীমা থাকিত না। পূর্ব্ব প্রবন্ধে কথিত ফরাসীদেশের স্বাধীনতাউদ্ধারকর্ত্রী "জন ডার্ক"কে ডাইনি বলিয়া পুড়াইয়া মারিবার ব্যবস্থাও সেখানে তাঁহারাই দিয়াছিলেন। জ্যোতিষী "গোলিলিও"কে কারারুদ্ধ করিবার ব্যবস্থাও তাঁহাদের দ্বারা হইয়াছিল। এরূপ অত্যাচারের দিনে চিন্তার স্বাধীনতা

কেমন করিয়া আসিবে ও জ্ঞানশাস্ত্রেরই বা কিরূপে উন্নতি হইবে। তাই দুর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী ধনীলোকের ও ধর্ম্মযাজকদের অত্যাচারে সাধারণ লোকে তখন বড়ই নিপীড়িত হইত।

এই অবস্থায় এমন একটি ঘটনা ঘটিল যে, এ দুর্দ্দিনের অবসান আপনিই আসিয়া পড়িল। রোমের পূর্ব্বরাজ্য মুসলমানদের হস্তগত হওয়ায় অনেক গ্রীকদেশীয় পণ্ডিত সে স্থান ছাড়িয়া ইউরোপের নানা দেশে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। এই প্রকারে তাঁহারা যে প্রাচীন গ্রীসদেশের অমূল্য দর্শন বিজ্ঞান ও নানারূপ কলাবিদ্যার জ্ঞানরত্ন সঙ্গে করিয়া বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়াছিলেন, সেই হইতেই স্বাধীন চিন্তা ও উন্নতির বীজ উপ্ত হইল। তখন দেশে স্বাধীন চিন্তার ধ্বজা উড়াইয়া সংস্কারক কর্ম্মবীরেরা দেশবিদেশে ভূরী ভূরী জন্মাইতে লাগিলেন। প্রাচীন দেশের লুপ্ত-প্রায় জ্ঞানের পুনঃ বিকাশের এমনই সঞ্জীবনী শক্তি। সকল লোকের মনে সকল বিষয়েই স্বাধীন ভাব আসিল। এই সময়েই "লুথার" "হিউম" "বেকন" প্রভৃতি মহাপুরুষদের আবির্ভাব। আর এই সময়েই "রুসো" "ভলটেয়ার" প্রভৃতি স্বাধীন চিন্তার পৃষ্ঠপোষক ফরাসী গ্রন্থকারদেরও অবতরণ। তাঁহাদেরই ভাব লইয়া ফরাসী জাতি স্বাধীনতার লীলাভূমি ফরাসীদেশে বিদ্রোহ আরম্ভ করেন (French Revolution)। তাঁহাদের উদ্দেশ্য, ধর্ম্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, ও রাজ্যসংস্কার। তাঁহাদের বুলি ছিল "Liberty Fraternity Equality" অর্থাৎ "সকল মানুষই স্বাধীন ও ভ্রাতৃস্থানীয় ও সমান। এইরূপ শুভ উদ্দেশ্য লইয়া আরম্ভ করিয়া কিন্তু পরে যেমন সব দেশেই হইয়া থাকে, তাঁহারা অনেকগুলি অহিতকর কার্য্যও করিয়াছিলেন, কিন্তু তবুও স্বীকার করিতে হইবে ফরাসীদেশ স্বাধীনতার প্রধান লীলাভূমি।

এই যুগেই "নেপোলিয়নের" আবির্ভাব হয়। তিনি ফরাসীদেশের অধীনস্থ ও বিখ্যাত কর্সিকা দ্বীপে এক সামান্য গৃহস্থের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

আর এই হীন অবস্থা হইতেই ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া ফরাসীদেশের সম্রাট ও ভুবনবিজয়ী নেপোলিয়ান হইয়াছিলেন। আধুনিক দিনে প্যারী নগরের যাবতীয় স্মৃতিচিহ্ন এই যুগের ও ইঁহারই কীর্ত্তি লইয়া হইয়াছে। তার দুটি ছবি পূর্ব্বে দিয়াছি। একটি ফরাসী বিদ্রোহের বিখ্যাত "বেষ্টাইলএর কারাগৃহ" অপরটি দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের কীর্ত্তিস্তম্ভ।

তখন ফরাসীদেশের ধনীলোকেরা বড়ই বিলাসী ছিলেন, প্রজাবর্গ ও সাধারণ লোকের উপর বড়ই অত্যাচার করিতেন। রাজসংসারের অবস্থাও তদ্রূপ ছিল। তাঁহারা বহু ব্যয়সাধ্য আমোদ আহ্লাদেই সময় কাটাইতেন। রাজ্যশাসনে কিছুই মনোযোগ ছিল না। বিদ্রোহীরা সমবেত হইয়া প্রথমেই ধনাগার লুঠিলেন, ও "বেষ্টাইল" জেলের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সব বন্দী খালাস করিয়া দিলেন। তারাও বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগ দিল, ও পরে রাজপ্রাসাদ অবরোধ করিয়া রাজা ও রাণী এবং রাজপরিবারস্থ ও উচ্চ পদবীর অনেক লোককে বন্দী করিল। তখন হত্যাকাণ্ডের আর অবধি ছিল না। অতি ক্ষিপ্রতার সহিত হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে একজন ডাক্তার একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন—তার নাম্ "গুইলটিন্"। নিমেষে ও অতি ক্ষিপ্রতার সহিত রাশি রাশি নরমুণ্ড সেই যন্ত্রের সাহায্যে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়। আমি লণ্ডন সহরে (Madan Transaud) "মাণ্ডাম টুরুসো" নামক এক বৃদ্ধা রমণীর যে বিখ্যাত দর্শনী আছে তার (Chamber of Horor) "ভীষণ জিনিসের দর্শনীয়" স্থানে এইরূপ একটি যন্ত্র দেখিয়াছি। একটি বৃহৎ ধারাল কুঠার কলে আপনিই উঠে নামে, ও তার তলায় নরমুণ্ড রাখিলে অনায়াসে নিমেষে তাহা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। এই কুঠারের সাহায্যেই "রাণী এনটনেট" নিহত হন। যখন তাঁর স্বামীকে ও তাঁহাকে ধৃত করিয়া বিদ্রোহীরা কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল তখন এক রাত্রের বিষম দুশ্চিন্তার ফলে সেই ভুবনবিদিতা সুন্দরী রমণীর সব চুল পাকিয়া

গিয়াছিল। মনের সহিত শরীরের এমনিই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আমার কাছেও একখানি ম্যাজিক লণ্ঠনের কাচ আছে, তাতে তাহার শেষ অবস্থা চিত্রিত। কয়েদীর পোষাক পরাইয়া পিছন দিকে হাত দুটি বাঁধিয়া যখন তাঁহাকে কুঠারের নিকট বিদ্রোহীরা নিয়ে এসেচে সেই অবস্থার ছবি।

এই সময়ে নেপোলিয়ন বিদ্রোহীদের তরফ হইতে সহরের শান্তিরক্ষক-পদে নিযুক্ত হন। সকল রাজকর্ম্মচারীদের তখন নিরস্ত্র করা হইতেছে। এইরূপ সূত্রেই নেপোলিয়নের ভাবী পত্নী "জোসেফিনের" সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়।

"জোসেফিন" তখন বিধবা। তাঁর স্বামী রাজ-সরকারে কাজ করিয়া একখানি অতি সুন্দর অসি উপহার পাইয়াছিলেন। সকল অস্ত্র কাড়িয়া লইবার সঙ্গে সেটিও লওয়া হয়, তাই ফিরাইয়া লইতে জোসেফিন তাঁর পুত্র "ইউজিনকে" নেপোলিয়নের নিকট পাঠান। বালক আসিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে নেপোলিয়নের কাছে সেইটি প্রার্থনা করিলে, নেপোলিয়ন একান্ত স্নেহপরবশ হইয়া সেটি তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। চতুরা জোসেফিন এই অবসর লইয়া নেপোলিয়নকে ধন্যবাদ দিতে নিজেই আসিলেন। সেই যে চারিচক্ষু এক হইল সেই হতেই নেপোলিয়ন তাঁহার রূপে গুণে মুগ্ধ হইলেন ও পরে তাঁহাকেই বিবাহ করিয়া একান্ত প্রণয়ে অনেক দিন একত্রে অতি সুখে ছিলেন। পরে নেপোলিয়নের পদবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার ভিন্ন মতি গতি হইতে লাগিল। তাঁর পত্নী তাঁহা হইতে ১৫ বছরের বড় ছিলেন। সেই কারণেই হোক বা যে কোনও কারণেই হোক—তাঁহাদের কোনও সন্তানই হইল না। তবে এ বিপুল ফরাসী রাজ্যের ভার নিজের অবর্ত্তমানে কে বহিবে এই ভাবিয়া নেপোলিয়ন নূতন দারপরিগ্রহ করিতে মনস্থ করিলেন।

তা ছাড়া আরও একটু কথা ছিল। নেপোলিয়ন সামান্য বিজিত দেশের লোক ছিলেন বলিয়া—ফরাসী দেশের সম্রাট হইলেও উচ্চ

রাজকীয় ও সদ্বংশের লোকের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ না থাকাতে বড় খাতিরও পাইতেন না। তাই ইদানীং তাঁর অভিলাষ হইতে লাগিল—বিবাহসূত্রে বড় ঘরের সহিত সম্বন্ধ পাতান। এই উদ্দেশ্যে নিজের সব ভাই-দেরও বড় ঘরে বিবাহ দিয়াছিলেন ও নিজেও অষ্ট্রীয়া সম্রাটের অতি সুরূপা কন্যা—"মেরী লুইসা"কে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করিলেন এবং তাঁহারা অমত করিলে যুদ্ধের অবধি ভয় দেখাইয়া পরে বিবাহ করিলেন। এইরূপ বড় ঘরে বিবাহ করাতে সেই সকল স্ত্রীলোকদের কেহই ইঁহাদের ঘরে সুখী হইতে পারেন নাই—সকলেই অশেষ কষ্টে দিন কাটাইয়াছেন। এই সম্বন্ধে, একটি সুন্দর প্রবন্ধ একটি ইতিহাসে পড়িলাম—"The last days of the wives of the Bonapartes." লেখক ওই সম্বন্ধে কতই গুপ্ত খবর ওই প্রবন্ধে সংগ্রহ করিয়াছেন।

জোসেফিন নেপোলিয়নকে একান্ত ভাল বাসিতেন। নূতন রাণীর তা বড় ছিল না। যখন নেপোলিয়ন জোসেফিনকে আপনার রূঢ় উদ্দেশ্যের কথা জানাইলেন—সেই বিষয়ের একটী বড় সুন্দর ছবি "লুভেয়ার গ্যালারী"তে আছে। একটি সুসজ্জিত ঘরে জোসেফিনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নেপোলিয়ন তাঁহাকে এই নিষ্ঠুর বার্ত্তা বলিলেন। শুনিবামাত্র জেসোফিন মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সেই অবস্থার চিত্র। আমার ঘরেও সেইরূপ ছবির একটি ছোট প্রতিকৃতি আছে। তার তলায় নেপোলিয়নের একটি উক্তি লেখা। জোসেফিনের একান্ত অনুনয় বিনয় ও মিনতিতে তিনি কেবল এইমাত্র উত্তর দিলেন—

"France and my destiny demand it."

"এ কাজ ফরাসী দেশ ও আমার ভাগ্যের খাতিরেই একান্ত বাধ্য হইয়া করিতে হইতেছে।" এই দিন হইতেই নেপোলিয়নের ভাগ্যশ্রীও ছাড়িতে আরম্ভ হইল।

সামান্য সৈনিকের পদ হইতে ক্রমশঃ উঠিয়া নেপোলিয়ন শেষে ফরাসী

দেশের সম্রাট হইলেন। সে দিনে তাঁহার অধিনায়কতায় ফরাসী দেশের বিক্রম কত। সমগ্র ইউরোপভূমিকে তিনি তখন কাঁপাইয়া ছিলেন। একে একে সকলেই হয় বিধ্বস্ত হইতেছিল, নয়ত তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে ব্যস্ত ছিল। প্রতিবাসী প্রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়া নেপোলিয়নের হাতে প্রথমেই বিধ্বস্ত হইল। স্পেন ও হলণ্ড তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া তাঁর বলবৃদ্ধি করিল। দ্বীপবাসী ইংরেজ তাতে বড়ই ভীত হইলেন। তাঁহারা ইউরোপের অন্যান্য দেশকে বিপুল অর্থ সাহায্য করিয়া যুদ্ধ দ্বারা নেপোলিয়নের বলক্ষয় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ওয়েলিংটন পর্ত্তুগালে প্রেরিত হইয়া সেখানে দুর্ভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া ফরাসীদের সেস্থান হইতে তাড়াইলেন। ওদিকে জলযুদ্ধেও বরাবর ইংরাজদের জয় হইতে লাগিল। নেপোলিয়নের ইচ্ছা ছিল, মিশর দেশ হস্তগত করিয়া পরে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন কিন্তু "নাইলের" যুদ্ধে নেলসনের হাতে হারিয়া তাঁর সে আশাও ছাড়িতে হইল। ক্রমে ট্রাফালগার, বলটিক প্রভৃতি নানা জলযুদ্ধে সর্ব্বত্রই হারিয়া নেপোলিয়ন দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি যে "বলনে" ১৩০,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ও ছোট ও চেপ্টা তলাযুক্ত নৌকা প্রস্তত করিয়া অনতিগভীর চেনেল পার হইয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, সে আশা তো পূর্ব্বেই ভাঙিয়া গিয়াছিল। কথা ছিল ডাচ রণতরী আসিয়া এ কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবে। কিন্তু ইংরাজ পোতাধ্যক্ষের কৌশলে সে সব পোত বন্দর ছাড়িয়া বাহির হইতে পারে নাই। তখন ইংরাজ পোতের সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়াছে, তাই দু'তিন খানি মাত্র ইংরাজ পোত বাধা দিবার জন্য সেখানে ছিল। কিন্তু তাহারাই সঙ্কেতের দ্বারা এই ভাণ করিল যেন অনেক পোত আছে। তাই ডাচ রণতরী ভয়ে বন্দর হইতে বাহির হইল না। ছয় ঘণ্টা সময় পাইলেই নেপোলিয়ন এ

পরে রুষিয়া জয় করিতে গিয়াই নেপোলিয়নের কাল হইল। তিনি যেমন সে দেশের মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, রুষিয়াবাসীরাও তাদের রাজার আদেশ অনুসারে সেই অঞ্চলের সব বাড়ী ঘর দ্বারে আগুন জ্বালাইয়া দিয়া পলাইতে লাগিল। পরে "মস্কউ"—অবধি পৌছিয়াও নেপোলিয়ন দেখিলেন, কেহ সন্ধির কথা তুলে না; তখন শীতকাল আসিতেছিল। তাই ফিরিতে হইল। আর এই শীতে অনাহারে নিরাশ্রয়ে ও পশ্চাৎ হইতে শত্রুদের আক্রমণে ১০ ভাগের একভাগ সৈন্যও বাড়ী ফিরে নাই। ইহাতেই নেপোলিয়নের অনেক বিচক্ষণ সৈন্যাধ্যক্ষ মারা যায় ও সেই কারণেই শেষে নেপোলিয়নের পতন হয়। এইরূপ কৌশলকে যুদ্ধশাস্ত্রে "passive resistance" বলে। শুধু ইহার ক্ষমতা আগুয়ান হইয়া লড়াই করা অপেক্ষাও ফলপ্রদ হইয়াছিল।

এইরূপ দুর্ব্বল অবস্থার সময় "রুষিয়া" "প্রুসিয়া" ও "অষ্ট্রিয়া" একত্র হইয়া তাঁহাকে রাজ্য ত্যাগ করিয়া দ্বীপচালানে "এল্‌বা" দ্বীপে পাঠাইল। কিন্তু অল্পদিন বাদেই আবার তিনি তথা হইতে পলাইয়া আসিলেন। তাঁহার প্রত্যাগমন দেখিয়া আবার তাঁহার দেশের সকল লোকই মহা উৎসাহের সহিত তাঁহার দলে যোগ দিল। পরিশেষে ওয়াটারলুর যুদ্ধে "ওয়েলিংটন" ও "বুলুকারের" হাতে একেবারে পরাস্ত হইয়া ইংরাজ কর্ত্তৃক নেপোলিয়ন ধৃত হইলেন ও সেণ্টহেলেনা দ্বীপে বন্দীরূপে ৭ বৎসর থাকিয়া ও অধ্যক্ষদের হাতে অশেষ যন্ত্রণা সহিয়া জঠরের ঘা (cancer of stomach) রোগে মারা গেলেন। এখন প্যারী নগরের হাঁসপাতালে অতি সামান্য ভাবেই ভুবনবিজয়ী বীরের মৃতদেহের সমাধি আছে।

নেপোলিয়নের পতনের পর আবার "বুর্‌বন্‌" বংশীয় রাজারা ফরাসী দেশের সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন। পরে ফরাসীদের সহিত জর্ম্মাণদের যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে হারিয়া ও "আলসাস" "লোবেন" নামক দুইটি স্থান হারাইয়া ফরাসী দেশ রাজাকে নির্ব্বাসিত করিয়া সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত

করিল। এখন সেই সাধারণ তন্ত্র সেই স্বাধীন দেশে তাঁদের বড়ই প্রিয়। তাঁহারা সাধারণতন্ত্রকে নারীরূপী কল্পনা করিয়া সে সহরের নানা স্থানে পূজা করেন।

কিন্তু যে কারণেই হোক আজকাল ফরাসী দেশের অবস্থা ক্রমেই হীন হইয়া আসিতেছে। জাতীয় পদবী হিসাবে তাঁরা এখন তৃতীয় শ্রেণীর শক্তি। দেখিতে সুন্দর সুসজ্জিত সরল ও সুভাষী হইলেও শৌর্য্যবীর্য্যে বড়ই দুর্ব্বল। দেশের লোক-সংখ্যা ক্রমাগত কমিতেছে। তবে বিজ্ঞান জ্যোতিষ চিকিৎসা ইত্যাদি বিদ্যার পণ্ডিত এখনও বিস্তর লোক সেখানে বিদ্যমান। জীবাণু বিদ্যা বিষয়ে পারদর্শী (Pasteur) "পেসটুর" এর এইস্থানেই জন্ম।

প্যারী হইতে লণ্ডনে।

বেলা এগারটার সময় প্যারী নর্ডষ্টেশন হইতে গাড়ী ছাড়িল। ইউরোপের উত্তরদেশস্থ সকল দেশেরই রেলগাড়ী গুলি খুব দ্রুত চলে। আমাদের বোম্বে মেলের গাড়ী অপেক্ষাও যাত্রীগাড়ীগুলি অনেক শীঘ্র যায়। এ সকল স্থানে সময়ের এত আদর ও সময় এত মূল্যবান্ যে, সকল গাড়ী ঘোড়া যান বাহনই অতিশয় বেগশীল। লণ্ডনসহরে (under ground electrice Railway ও Tube) অর্থাৎ মাটীর নীচে দিয়া যে বৈদ্যুতিক ট্রেণ ও নলের ভিতর দিয়া সে রেলগাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে সে সবগুলি,—গাড়ী ঘোড়ায় বাধা পাইতে হয় না বলিয়া, ঠিক তীরের মত বেগে চলে। ৫০।৬০ ক্রোশ দূর হইতে লোকে অনায়াসে ও অতি অল্প সময়ে আসিয়া সহরের কাজ কর্ম্ম করে। এরূপ ব্যবস্থাতে কত সুবিধা। সহরে যাদের কাজ কর্ম্ম করিতে হয়, তাদের সহর হইতে অনেক দূরে থাকিলেও চলে, তাই সহরটিও তত ঘিঞ্জি হয় না।

কিন্তু দক্ষিণ ইউরোপের অর্থাৎ ইটালী প্রভৃতি স্থানের গাড়ীগুলির ঠিক উল্টা ব্যবস্থা। ব্রিন্দিসী হইতে ভারতের ডাক লইয়া যে গাড়ী ক্যালে বন্দরে পৌছাইয়া দেয়, সে গাড়ী ডাকগাড়ী হইলেও এত আস্তে চলে যে, ইংরাজ সরকার এখন ইতালীয় গবরমেণ্টকে ভয় দেখাইয়া লিখিয়াছেন যে, এমন হইলে আর ও পথে মেল আনা হইবে না। তাতে ইতালীর এত পাওনা পাছে বন্ধ হইয়া যায়, এই ভয়ে তাহারা এখন প্রাণপণে গাড়ীর গতি বাড়াইতে চেষ্টিত।

ইউরোপের দক্ষিণদেশ সমূহের কথা উঠিল বলিয়া এই স্থানে আর একটি কথা বলিয়া রাখি। এখন ইউরোপের উত্তর দিকের কথাই ক্রমিক বলিতে হইবে বলিয়া এইস্থানে দক্ষিণ দেশ হইতে তাহাদের যে

অতিশয় প্রভেদ আছে, সে কথা জানা উচিত। দক্ষিণ ইউরোপের লোকেরা অনেকটা আমাদেরই মত। তাদেরও রং মাটো মাটো, চুল ও চোক কাল। সঙ্গীতও অনেকটা আমাদেরই ধরণের। তারাও আমাদের মত অল্প তাতেই ভাবে, অধীর হয়—সহজেই কাঁদে হাসে। উত্তর ইউরোপের শীতপ্রধান দেশের লোকের মত তাদের ধীর কষ্টসহিষ্ণু ভাব নহে। এমন অনেক কারণ আছে যা হইতে কতক বুঝা যায় যে,—সে শীতপ্রধান দেশের লোকেরাই শেষে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকদের অপেক্ষা ক্ষমতাবান্ হইবে। সেটি বোধ হয়, কতকটা প্রকৃতিরই নিয়ম। কারণ তাহারা আরও বেশী কষ্ট সহিষ্ণু বুদ্ধিজীবী ও নুতন জাতি।

তাড়াতাড়িতে রেলগাড়ী চড়িবার পূর্ব্বে আহার করিয়া লইতে ভুল হইয়াছিল। আর ঘটনাক্রমে সে গাড়ীখানিতেও ডাইনীংকার বা আহার করিবার গাড়ীও লাগান ছিল না। অনেক ঘোরা ফেরা করিলে, বিশেষ রেলে যাতায়াতের সময়, বেশী ক্ষুধা হয়। বড়ই ক্ষুধার উদ্রেক হইতে লাগিল। সে গাড়ীতে একটি বৃদ্ধা রমণী ও তাহার এক কন্যা ছিলেন। তাঁহারা শীতকালে মিশরদেশে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য গিয়াছিলেন, এখন বাড়ী ফিরিতেছিলেন। তাঁহাদর সঙ্গে সুন্দর সুন্দর সুব্যবস্থায় বাঁধা অনেক মোটমাট ছিল। চক্‌চকে চামড়ার বেগ ও পোটমাণ্টগুলি কাপড়ের ঘেরা দিয়া ঢাকা। সঙ্গে একটি বেতের টিফিন বক্সও ছিল। নারীসুলভ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে আমাদের ক্ষুৎপিপাসাতুর মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, আমরা অভুক্ত আছি। আর অমনি স্নেহের উৎস ছুটিয়া বাহির হইল। আপনাদের সেই বাস্‌কেটটি হইতে খাদ্যদ্রব্য বাহির করিয়া আমাদের খাইতে দিলেন। সবই তৈয়ারী ছিল। ছোট ছোট চাক্‌লা কাটা রুটীতে মাখন ও জাম্ মাখান। খানকতক সেন্‌ড-উইচ। খানকতক চোক্‌লেট ও গুটিকতক বাদামভরা লেবেন্‌চুস্ হাতে

সুশিক্ষার এমন সরল মধুরভাব যে কথা কহিতে কহিতে ও তাঁদের সহিত একত্র খাইতে একবারও মনে হইল না যে, অপরিচিত লোকের কাছে খাচ্ছি বা তজ্জন্য কোন লজ্জাও অনুভব হইল না।

আহারান্তে ধন্যবাদ দিয়া একত্র বসিয়া কত মধুর কথা হইতে লাগিল। একবারও মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন না, কোথা হইতে আসিতেছি। এরূপ প্রশ্ন তাঁহাদের দেশের রীতি নয়। আমরা কিন্তু নিজের পরিচয় নিজেই দিলাম ও সোঝাসুজি প্রশ্ন করিয়া তাহাদেরও সবিস্তার পরিচয় লইলাম।

তাঁহাদের ইয়র্ক সায়ারে বাড়ী। সেখানে তাঁদের জমী-জারাৎ ও চাষ-বাস এবং পশুপালনের ব্যবস্থা আছে। তাঁদের সতেরটি বড় বড় গাভী আছে, সবগুলিতে প্রায় ২ মণ দুধ দেয়। তা হইতে টাটকা মাখন তৈয়ারী হইয়া লণ্ডনের বাজারে নিত্য বিক্রয়ের জন্য আসে। প্রত্যিদিন প্রায় পাঁচশত মুরগীর টাটকা ডিমও বাজারে রপ্তানী হয়। শস্যক্ষেত্রে বড় বড় ঘাস ও ওট প্রভৃতি ফসল বুনা হয়। সেগুলি সবই ঘোড়া ভেড়া গরুর আহারের জন্য, মানুষের জন্য নহে। তারা এই সকল আহার করিয়া হৃষ্টপুষ্ট হইয়া সুস্থ সবল বাচ্ছা প্রসব করে ও সারাল সুমিষ্ট দুধ দেয়। উহাদের কেহ কেহ বা কষাইয়ের হাতে বেশী দামে বিক্রয় হয়। পশু পক্ষীগুলি সব খোলা থাকে, ও ঘেরা যায়গায় চারিদিকে চরিয়া বেড়ায়। পশু পক্ষীর চামড়া ও হাড়ও বিক্রয় হইয়া পয়সা আনে। গোবর গুলি সারের জন্য ব্যবহৃত হয়। অমন সুন্দর সার আমরা এদেশে অজ্ঞতা বশত পুড়াইয়া নষ্ট করি। সে দেশে ব্যবহারের জিনিষ একটুও কিছু ফেলা যায় না। এত কাজ করিতে দুটিমাত্র লোক নিযুক্ত আছে। মেয়েটি নিজেই তার অর্দ্ধেক কাজ করেন।

ফরাসীদেশের উত্তর দিক্‌ দিয়া গিরিনদী হ্রদ পার হইয়া গাড়ী প্রবল বেগে ছুটিতে লাগিল। সকল স্থানই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সবুজ ঘাসগুলি

ছাটা ও চারিদিকের জমি বেড়া দিয়া ঘেরা। বাড়ীগুলি সব সমান ও কাচের জানালা দিয়া শোভিত। কত স্থানে কৃষক ও কৃষকবধূ একত্র ক্ষেত্রকর্ম্ম করিতেছে দেখা গেল। কাঁচের ঢাকা দেওয়া ফুলগাছ ও কপিগাছ প্রভৃতি শাক সব্জী গাছগুলি হীম হইতে ঢাকা। ছোট ছোট কৃত্রিম স্রোতস্বতী স্বচ্ছ সলিল বহিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। ও তার আশে পাশে ছোট বড় কলকারখানা বিদ্যমান। যেখানে সেখানে ব্যবসা বাণিজ্যের এডভারটিসমেণ্টের প্রাচুর্য্য।

বেলা চারিটার সময় "ক্যালে" পৌছিলাম। জাহাজে চড়িবার জেটী ও রেলের ষ্টেশন খুব নিকটে নিকটে। ফরাসী দেশের মুটে আসিয়া ভারি ভারি মোটগুলি অনায়াসে একা লইয়া গেল। ট্রেণ আসিতে কিছু দেরী হওয়াতে জাহাজটি তখন ব্যস্ত হইয়া ঘন ঘন সিটি দিতেছে।

এই ক্যালে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ছোট ও সামান্য বন্দর হইলেও এই স্থানটি লইয়া ইংরাজ ও ফরাসীতে কতই যুদ্ধ হইয়াছে। সমুদ্রের উপর নিজের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ইংরাজ সকল বন্দরই হাতে রাখিতে চান। এখনও স্পেনের রাজ্যে ভূমধ্যস্থ সাগরের প্রবেশপথেও জিব্রলটার ইংরাজের অধিকৃত আছে।

বিশেষ এই ক্যালে ইংলিস চেনেলের অপর পার বলিয়া দখলে রাখিলে বিশেষ সুবিধা। কিন্তু বার বার দখল করিয়াও ইংরাজ ইহা বরাবর নিজের তাঁবে রাখিতে পারেন নাই।

ইংলিশ চেনেল।

জাহাজে মাল-বোঝাই, লোক-বোঝাই ও জেটী হইতে বাঁধা খুলা নিমেষেই হইয়া গেল। বিপুল রবে সিটি দিয়া "কুইন" নামক ষ্টীমারখানি ক্যালে বন্দর হইতে ছাড়িল। চেনেলে এ সকল জাহাজগুলি এত বেগে যায় যে, অন্য কোথাও এমন দেখি নাই। প্রণালী হইলেই প্রায় তুফানময় হয়, কারণ বাহির সমুদ্রের সকল ঢেউ ক্ষুদ্রপথে ঢুকিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া বিপুল আন্দোলন করিয়া তুলে। তবে ইংলিশ চেনেলের ঢেউ আরও ভয়ানক। আবার চারিদিকের বেলাভূমিতে প্রতিহত হইয়া ঢেউগুলি বারবার ফিরিয়া আসে বলিয়া এসব স্থান সর্ব্বক্ষণই অল্পবিস্তর তুফানময়। বড় বড় তরঙ্গগুলির উপর দিয়া আছড়াইতে আছড়াইতে, ফেনা কাটিয়া তুমুল বেগে, আমাদের জাহাজখানি পশ্চিম মুখে চলিতে লাগিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। পশ্চিম আকাশ লাল করিয়া সূর্য্যদেবের রক্তিম ছবিখানি নীল জলে ডুবিতেছিল। সে সময়ের যে গম্ভীর ভাব, সে স্থানের যে ভীষণ শোভা, সে সব বর্ণনারও অতীত।

খানিকক্ষণ মাত্র দেখা গেল, ফরাসীদেশের জমির উপর দূরে দূরে অনুচ্চ পাহাড় ও নিকটে ও দূরে দুই একটি দ্বীপ। তার অনেকগুলি মাথায় স্তম্ভ তোলা ও তাতে আলো ও ধ্বজা লাগান। এ স্থানটির গভীরতা বড় বেশী নয় ও ইহার নিকটেও অনেক নিমজ্জিত চড়া বা দ্বীপ আছে। বিখ্যাত "গড উইন সাণ্ড" ইহারই একপ্রান্তে বর্ত্তমান। জাহাজও অনেকগুলি এখান দিয়া যাতায়াত করে। এই সকল কারণে এখানে আলোকস্তম্ভ চারিদিকেই দেখা যায়। অনেকগুলি আবার সমুদ্রগর্ভে

হইতেই উত্থিত। সে গুলি সব নীল, লাল, সবুজ প্রভৃতি নানারূপ আলো দেখাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলিতেছে। একবার নিষ্প্রভ, আবার পূর্ণ দীপ্তিমান্। তাদের দিকে দেখিলে কি এক অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাব মনে জাগে। এই অতি ভীষণ স্থানে, একা একা দাঁড়াইয়া তারা মানব-বুদ্ধি ও মানব-শক্তির জয় ঘোষণা করিয়া, বিপন্ন পথিককে পথ দেখাইতেছে। দেখিতে দেখিতে রজনী আরও ঘন হইয়া আসিল, জাহাজের সে আলোর দীপ্তি আরও উজ্জ্বলতর হইল, আকাশেও অসংখ্য তারা জ্বলিয়া উঠিল।

তখন আমরা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে ঢেউয়ের উপর দিয়া দুলিতে দুলিতে তীরের মত বেগে ছুটিতেছি। জাহাজখানি যাত্রীতে পরিপূর্ণ। তার অধিকাংশ লোকই ডেকে দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের কাল মুখের ও বিজাতীয় পোষাকের দিকে অনেকে বিস্মিত হইয়া একদৃষ্টে চাহিতেছিল। অনেকে যা কোনও উপলক্ষ করিয়া কথা কহিয়া আলাপও করিলেন। তারা সকলেই সুস্থ সবল সুন্দর সুবেশী ও সুভাষী। রমণীদের চোখে বিস্ময় ও স্নেহের ভাব। একটি বৃদ্ধা আমাদের কাছে আসিয়া আমাদের সহিত একান্ত আত্মীয়তা করিয়া বলিলেন যে, তিনি আর এক ভদ্রলোকের নিকট শুনিয়াছেন যে, আমরা খাইতে পাই নাই। তাঁহার কাছে কিছু খাবার আছে, তিনি কি দিতে পারেন। আমাদেরও তখন বিলক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। সম্মতি জ্ঞাপন করিলেই, তিনি নানারূপ sweets বা মিষ্টান্ন ও বিস্কুট আনিয়া দিলেন। একান্ত স্নেহ ও শ্রদ্ধার দেওয়া তাঁহার হাতের মিষ্টান্ন সেদিন কি যে আমার মিষ্ট লাগিয়াছিল, তা কখনও আমি ভুলিব না। যে দুইজন আমাদের আহার দিলেন, একজন রেল গাড়ীতে ও অপর জন এখানে তাঁহারা, কি আশ্চর্য্য—দুজনাই স্ত্রীলোক। চারিদিকে এতগুলি তীক্ষ্ণদৃষ্টি পুরুষ ছিলেন, তাঁহাদের কাহারও চোখে আমাদের উপবাস-ক্ষুণ্ণ মুখের ভাব প্রতীয়মান হলো না।

আহারাদি করিয়া হাতব্যাগ ছড়ি কম্বল তাঁহাদের জিম্মাতেই রাখিয়া একবার জাহাজের চারিদিক ও ভিতর তালাগুলি দেখিতে চলিলাম! তাতে চারিটি তালা আছে তার মধ্যে একটি তালাতে সুন্দর সেলুন বিদ্যমান। এইখানেই বসিবার ও খাইবার ঘর Refreshment room ও Dinnig room আছে, uniform বা সবই একরকম পোষাক-পরা রমণীগণ চা, রুটী ও খাদ্যদ্রব্য জোগাইতেছেন। এখানে অনেক লোকেই মদ খাইতেছে দেখিলাম। খাদ্যদ্রব্যের তত আদর নাই। প্রতি তালাতেই সুন্দর সুন্দর কেবিনও আছে। সেগুলি অতি ছোট পরিপাটি ও সকল আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কাছে কাছে দিয়া সাজান। সুনিয়মে সুব্যবস্থা যতদূর হইতে হয় সেখানে সেইরূপ দেখিলাম।

কলঘরের চারিদিকে বারান্দা। সেখানে দাঁড়াইয়া কল চলা দেখিলে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হয়। কাল কাল তেলা সরু মোটা চাকা ও রডগুলি নিজ নিজ বর্ত্মে থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরিতেছে। আর সেই আবর্ত্তে অজানিতে প্যাডেল ঘুরাইয়া জাহাজখানিকে নিমেষে কত দূরে লইয়া যায়। "বইলার" হইতে বাষ্প আসিয়া "পিষ্টন রড"টিকে ঠেলে, আর তার সঙ্গে সংলগ্ন কতগুলি চাকা ও রড একত্র ঘুরিয়া গিয়া অন্যান্য বিভিন্ন কাজের উপযোগী যন্ত্রগুলিকেও শক্তি দেয়। Ecentric wheel এর এমন সুব্যবস্থা যে, তাতে ঘূর্ণমান গতি ঠেলা গতিতে পরিণত হয় ও এইরূপ প্যাডেল বা ককস্ক্রু ঘুরাইয়া জল কাটিতে কাটিতে জাহাজ চলে। "গভর্ণরটি" ঘুরিয়া একটি বাষ্প যাইবার ছিদ্র এমন করিয়া সামলায় যে, আপনিই জাহাজের অতিরিক্ত বা বিপজ্জনক গতি হইতে দেয় না। চারিদিকই এইরূপে বুদ্ধির সহিত সুকৌশলে সামলান। তাই কয়লা, লোহা ও জল মানুষের ভৃত্য হইয়া তাঁদের কাজ করে। আর এত সব এঞ্জিন একজন নেতার অধীনে। তিনি উপরে দূরে

থাকিয়া একটি মাত্র চাকা ঘুরাইয়া নির্দ্দেশ করিয়া সমস্ত জাহাজটি অমন বিপদ্‌সঙ্কুল পথে একখানি খেলার নৌকার মত অনায়াসে চালাইতেছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জাহাজখানি অতি দ্রুত চলে। প্রায় দুই ঘণ্টায় ৬০ মাইল যায়। এইটুকু সময় মাত্র আসিয়াই ইংলণ্ডের সমীরেখা দেখা যাইতে লাগিল। সেটি একটি সাদা উচু স্থান "ডোভার" বন্দরের শ্বেত খড়িমাটির অনুচ্চ পাহাড় "White chalk cliffs of Dover"। যে ইংরাজী ছত্রটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম, সেইটি একটি কবিতার ছত্র। একটি সুন্দর ঘটনা উপলক্ষ করিয়া সেই কবিতাটি লেখা হয়। একজন ইংরাজ ফরাসীদের সঙ্গে জলযুদ্ধে হারিয়া বন্দী হইয়া, অনেক দিন কারারুদ্ধ থাকিয়া পরে গোপনে একখানি ছোট ভেলায় করিয়া এই তরঙ্গময় প্রণালী দিয়া পলাইয়াছিল। অনেক দিন অনশনে জলের উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া, এক দিন দিবালোকে নীল জলের ধারে একপ্রান্তে "ডোভারের" এই পাহাড়টির সাদা চূড়া দেখিয়া চিনে। পুনরায় সে যখন মাতৃভূমির রেখা দেখিতে পাইল তখন অতিশয় আনন্দোল্লাসে বলিয়া উঠিয়াছিল—"এই যে" আমাদের "White chalk cliffs of Dover" নিকটে। এখন এখানে একটি ছোট সেনানিবাস আছে, ও একটি জেলখানাও আছে। আর তা ছাড়া—কেল্লা, উঁচু টাউয়ার, নানারূপ ধ্বজা-পতাকাও সমুদ্র হইতে দেখা যায়।

জাহাজ একেবারে জমিতে আসিয়াই লাগে। এ সব তাড়াতাড়ির দেশে ব্যবস্থা সবই এমন সুন্দর যে কোনও কাজে অযথা দেরী হয় না। নিমেষে জাহাজ ভিড়ান হইল, সিড়ি ফেলা হইল। সকল যাত্রীরা আগে হইতে ব্যাগ ও টিকিট হাতে করিয়া, প্রস্তুত ছিলেন। পথ খুলিবামাত্র নিজ নিজ ব্যাগ হাতে করিয়া জাহাজ হইতে জমীতে নাবিলেন। আমার—"Old England"এর পুণ্য জমিতে অবতরণ করিয়াই সর্ব্ব শরীর যেন

পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। বাস্তবিকই মনে উপলব্ধি হইতে লাগিল যে এ পুণ্য ভূমিতে সকলেই সমান স্বাধীন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে সব দেশে সচরাচর চলা ফেরা সব যেন দৌড়ানর মত। সকল দৃশ্যই সজীব তৎপর। ছুটিয়া ব্যাগ হাতে করিয়া গাড়ী ধরিলাম। সে রেলগাড়ী খানিও জাহাজের ধারে আসিয়া লাগিয়াছে। এখানেও একজন সহৃদয় ব্যক্তি আবার আমাদের খাওয়াইয়াছিলেন। এইবার তৃতীয়বার ইংরাজের দেশে আসিবার পথে—তিন জন ইংরাজ আমাদের অযাচিতে আদর করিয়া অতিথিসেবা করিলেম। তার মধ্যে সবাই অপরিচিত। দুইজন রমণী ও একজন পুরুষ।

এই পুরুষটি ভারতবর্ষ হইতেই বাড়ী ফিরিতেছিলেন। আসামে তাঁহার চা-বাগান আছে। আজ ২৫ বৎসর ভারতবর্ষে আছেন। দেখিতে সুস্থকায় ঢেঙা মোটা সোটা ও সুপুরুষ। চুল পাকিয়াছে, বয়সও হইয়াছে, তবুও মুখে হাসি লাগিয়া আছে। ইঁহার সহিত জাহাজেই পরিচয় হইয়াছিল, সেখানে নানারূপ খেলা হইত, তখন তিনি অল্প বয়সী স্ত্রীলোকদের দলে মিশিয়া কত রকম খেলা করিতেন। তাঁহার এমন সুন্দর ব্যবহার ও মনের ভাব যে, জাহাজ শুদ্ধ সকল লোকই তাঁহাকে সমান ভালবাসিত। আসিবার সময়ও তাঁহার সঙ্গে একত্র এক জাহাজেই এলাম। এখনও তাঁহার সহিত চিঠি লেখালেখি আছে। জাহাজে তিনি আমার কতগুলি ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বই লইয়া পড়িয়াছিলেন ও আমাদের দেশের সম্বন্ধে কত কথাবার্ত্তা কহিতেন। তিনি আমাদের অনেক বিষয় জানেন ও সহানুভূতিও করেন। তিনি সে সব পড়িতে বড়ই ভালবাসেন। তাঁহাকে দেখিলে কাহারও মনে হবে না যে, তিনি "নীলকর" বা 'চা'কর সাহেব—যাঁদের সম্বন্ধে "নীলদর্পণে" এত কথা লিখা আছে।

আরও দেখা যায়—আংগ্লো ইণ্ডিয়ানদের ভারতবর্ষীয় দেশীয় অবজ্ঞাভাব জাহাজে চড়িয়া বিলাতে আসিবার পূর্ব্বে ক্রমেই কমিয়া যায়।

স্থান ও অবস্থা বিশেষে মনের এরূপ ভাব পরিবর্ত্তন আকস্মিক ঘটনা নহে। মানবহৃদয়েরই একটু গূঢ় তত্ত্ব ইহাতে নিহিত আছে। সেটি এই যে কোনও জিনিষের উপলব্ধি বা স্ফূর্ত্তি তার আশপাশের অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে। নিজ দেশে ইংরাজ জাতি কতই মহান্, কিন্তু স্থানান্তরে যাইলে আবহাওয়ার দোষে উৎপ্রোথিত ফুল গাছের মত তাহাদের স্বাভাবিক ফুল ও ফল অনেকটা শুকাইয়া যায়।

কত সদাশয় ইংরাজ আছেন ভারতবর্ষে তাঁহাদের সঙ্গে কখনও কোনও সংশ্রব হয় না বলিয়াই তাঁহাদের ভাল বলিয়া জানি না। আবার সংশ্রবের অভাবেই পরস্পরে কত মন্দ কল্পনা আসে। চাকুরী বা কাজের সম্বন্ধে ছাড়া পাশাপাশি থাকিয়াও তেলে জলে থাকার মত কিছুমাত্র মিশ না খাইয়া থাকিতে হয়। এস্থলেই যত গোলমালের গোড়া। আমাদের সামাজিক কুসংস্কারে তাঁহাদের সহিত মিশি না, তাঁহাদেরও এদেশীয় ভাষা জানার একান্ত অভাবে ও অন্যান্য নানা কারণে তাঁহারাও মিশিতে পারেন না। বিলাত দেখিয়া মনে হয় বিদ্যুৎবহা তারটি চাবিতে ভাল করিয়া লাগে নাই বলিয়া তড়িৎ ভরা কোষের বিদ্যুৎ সে পথে ঠিক চলে না। সামান্য প্রতিকার অভাবেই এত জঞ্জাল ঘটে। কেউ যদি সেই তারটিকে ভাল করিয়া মরিচা উঠাইয়া ঘনিষ্ঠ ভাবে চাবিটিতে জড়াইয়া দেয়—অনেক উপসর্গ নিমেষে দূর হয়। আজকাল কটু রুক্ষ তীব্র ঔষধের দিন নয়। ভাল করিয়া রোগ নির্ণয় করিয়া ঠিক স্থানে সামান্য ঔষধ দিলেই রোগ অচিরে সারিয়া যায়।

গাড়ী সিটি দিতে দিতে প্রবল বেগে ছুটিতে লাগিল। তখন রাত্রি হইয়াছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে। তবে এ সব দেশের গাড়ীগুলির জানালা কাচ দিয়া বন্ধ থাকায় ভিতরে বড় শীত লাগে না। অথচ জানালা দিয়া বাহিরের সকল জিনিষই দেখা যায়। প্রথম প্রথম বন্দরের নিকট

গুদাম, কারখানা, দোকান, পশার ইত্যাদি। কিন্তু খানিকক্ষণ পরে অস্পষ্ট আলোকে মাঠ ঘাট গ্রাম্য ছবিও দেখা যাইতে লাগিল। সকলগুলিরই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শ্রীমাখান ভাব।

তখন আমার মনের এক অপূর্ব্ব ভাব এক চমৎকার অবস্থা। নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এ কোন্ স্থানে এসেছি? একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে? সেখানে এসে আমার মনের এমন অপূর্ব্ব ভাব হচ্চে কেন?" বিস্ময়ে ও আনন্দে মনের অবস্থা তখন বর্ণনারও অতীত। এইরূপে নানারূপ কথা ভাবিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। বারবার এই প্রশ্ন ও তাহার উত্তরের চেষ্টা মনে আসিতে লাগিল। এ কথাগুলির উত্তর দিতে পারিবার পূর্ব্বেই "টেমস নদীর" সাঁকোর উপর দিয়া গাড়ীখানি সশব্দে গড়াইয়া "ভিক্টোরিয়া" ষ্টেশনে পৌছিল।

এই সেই লণ্ডন সহর। এই ক্ষুদ্র দ্বীপ হইতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া অর্দ্ধেক পৃথিবী শাসিত হইতেছে। তার মাটী জল সবই আমাদের মত কেবল হাওয়া একটু ঠাণ্ডা। এইটুকুতেই কি ইতিহাস ইত্যাদিতেও আমাদের হইতে এত প্রভেদ হলো।

আমি কাহারও সহিত কিছু ঠিক করিয়া যাই নাই যে, সেই অজানা অজব বিদেশে তিনি আমাকে ষ্টেশনে লইতে আসিবেন। কিন্তু আর একটি বম্বেবাসী ভারতবর্ষীয় সহযাত্রীকে নামাইয়া লইতে তাঁহার এক বন্ধু সেই ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। শুভক্ষণে তাঁহার সহিত দেখা হইল।

তাঁহার সঙ্গে সেই একবার দেখাতেই যে চিরজন্মের মত কত সৌহৃদ্য জন্মে গেল, তা তোমরা বুঝিবে না। বিদেশে কালমুখ দেখিলে যে কত আনন্দ—কত সদ্ভাব হয়, তা যাঁরা বিদেশে না গিয়েছেন তাঁরা বুঝিবেন না। যেন কত দিনের পরিচিতের মত তখনই তিনি আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হইলেন। তিনি জাতিতে পার্সী। বিখ্যাত ধনী সওদাগর ও দাতা বম্বেবাসী

খ্যাতনামা জেম্‌সেটজী টাটা মহোদয়ের ভাগিনেয়, তাঁর ছোট নাম "সপুরজী"। তিনি "ওয়েষ্টীং হাউস" নামক লণ্ডনে একটি ইলেক্‌ট্রিক ফিটিং আফিসের তত্ত্বাবধানে আছেন। আমাদের দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও লোকশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার বড়ই উৎসাহ।

তখন তিনি ডাবিসায়ারের একটি রমণীকে বিবাহ করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। সেই রমণীও তাঁহার সহিত ষ্টেসনে আসিয়াছিলেন। সে উন্নত স্বাধীন দেশে এ সব সুন্দর দৃশ্য দেখিলে চোখ জুড়ায়। ইহার কথা আরও পরে বলিব।

অতিশয় তৎপরতার সহিত মালপত্র ভ্যান হইতে নামাইয়া একজন কর্ম্মচারীর উপর পৌঁছাইবার ভার দিয়া তিনি আমাদের সঙ্গে করিয়া মাটীর নীচের রেলগাড়ী দিয়া (Tube Railway) আমাদের এক হোটেলে লইয়া গেলেন। সে ইলেক্‌ট্রিক রেলগাড়ী বিদ্যুদ্বেগে এক এক মিনিট অন্তর আসিতেছে ও যাইতেছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বড় বড় কেবিনগুলিতে সব পাশাপাশি চেয়ার পাতা, কাহারও সহিত কাহারও গা ঠেকে না। ভিতরটি প্রখর বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত; সে তীক্ষ্ণ জ্যোতি দিনের আলোককেও হারাইয়াছে। এক একটি এইরূপ ক্যাবিনে প্রায় ৬০ জন যাত্রী। সকলেরই সুবেশ সুন্দর গম্ভীর মুখশ্রী ও হাবভাব। সে স্বপ্নের মত দৃশ্য পূর্ব্বে কখনও কোথাও দেখি নাই। ফরাসী দেশের লোক হইতেও তাঁদের গঠন শ্রী ও হাবভাব কত প্রভেদ—কত উন্নত। অত জনতার মাঝে কাহারও মুখে একটু কথা নাই। সবাই নিজ নিজ কাজ বা চিন্তা লইয়া ব্যস্ত। তবে আমরা বিদেশীয় বেশ-ভূষা ও কাল মুখশ্রী লইয়া প্রবেশ করিলে সকলেই বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া চোখ ফিরাইয়া লইলেন। সে দেশে কাহারও দিকে অল্পক্ষণ চেয়ে থাকাও ভদ্রতা-বিরুদ্ধ কাজ।

পাঁচ মিনিটে পাঁচ মাইল গেলাম। পরে (Kings cross Station)

"কিংস্ ক্রস্" নামক ইষ্টিশনে উত্তীর্ণ হইয়া নিকটবর্ত্তী "হুইট্‌নীর পারিবারিক হোটেলে" (Whitney's family Hotel) দরজায় ঘণ্টা টিপিলাম। এক মোটাসোটা এপ্রণ পরা মেম আসিয়া আমাদের দরজা খুলিয়া দিল। পরে জিনিষ পত্র সেখানে রাখিয়া আমরা নিকটবর্ত্তী একটি হোটেলে আহার করিতে গেলাম। সে দেশে থাকিবার ও খাইবার কিছুই ভাবনা নাই। সবই নিয়মে চলে—দরদস্তরও বড় একটা নাই। খাদ্য দ্রব্যও সব ভেজালহীন। রাত্রিতে সেখানে মধ্যবিৎ রকমের ভোজন করিতে দেড় শিলিং লাগে ও হোটেলে এক রাত্রি বাস করিতে—চারি শিলিং ছয় পেন্স খরচ হয়।

এইবার একটু "চেনেলের" ইতিহাস সংক্ষেপে বলিয়া, "বিলাতের পথে" নামক এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

এই ৬০ মাইল প্রশস্ত ইংলিস চেনেল, এক চিরপ্রসিদ্ধ স্থান। নিকটবর্ত্তী জাতিরা, কে জানে কেন সকলেই প্রবল-প্রতাপ বীরজাতি। এই চির-বিক্ষুব্ধ জলের উপর রাজ্য ও ধনলাভের জন্য তাঁহারা কতই যুদ্ধ খেলা না খেলিয়াছেন। প্রাকালে "নর্সমান" ও "ডেনেরা" এই সকল পথেই দস্যু হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত ও "ভিকিংদের" ছোট ছোট দাঁড়ফেলা নৌকাগুলি বোম্বেটে দস্যুর দল লইয়া এই সব স্থানেই লুট-তরাজ করিতে আসিত। খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীতে "রোম্যান"দের "গ্যালে"গুলি মহাবীর "সীজরের". নেতৃত্বে এই পথে আসিয়া, ছলে বলে কৌশলে ব্রিটেন জয় করিয়াছিল। তখন সেখানেও পুরোহিতদের প্রাধান্য ছিল। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, ভারতবর্ষে রমণীজাতির অবস্থা হইতে সে সোণারদেশে রমণী জাতির অবস্থা চিরকালই স্বাধীন। এমন কি পুরোহিত ও রমণীরাও স্বহস্তে অস্ত্র ধরিয়া স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যথা—"রাণী . বডিসিয়া।" আবার ইহাদের এমন আগ্রহসত্ত্বেও

নিজের দেশের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করিয়াছিল। ঠিক কি আমাদেরই দেশের মত!

তার পর যখন ৫০০ বৎসর রাজত্ব করিয়া রোমানরা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান, এমন বীর জাতিরও তখন পরাধীনতায় কত দুর্ব্বলতা আসিয়াছিল। তাহারা আর তখন নিজেরা নিজেদের দেশ রক্ষা করিতে না পারিয়া "সক্‌সন্"দের সাহায্য চাহিলেন। তাহারাও আবার এই জলপথে আসিয়াই "এবস্‌ফিলডে" নাবেন, ও "পিট স্কটদের" তাড়াইয়া নিজেরাই ইংলণ্ড অধিকার করিয়া বসেন। এটিও ঠিক যেন আমাদের এ দেশের স্থান বিশেষের লড়াইয়ের মত।

আবার একাদশ শতাব্দীতে এই পথেই "নর্ম্মাণরা" আসিয়া ইংলণ্ড জয় করেন। কতদিন ধরিয়া দারুণ দুর্ব্ব্যবহার করার পরে সেই দেশেরই লোকের সঙ্গে মিলিয়া গিয়া তাঁহারা এখন এমন এক মহা পরাক্রান্ত জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন। কত দেশের বীররক্ত একত্র মিলিয়া তবে ব্রীটনে এই বীরজাতি সৃষ্ট হইয়াছে। এটি ঠিক আমাদের ভারতবর্ষেরই বিরুদ্ধ অবস্থা। জাতিভেদ থাকায় আমাদের এদেশে এমন রক্তের মিলন কখনও হয় নাই। সেই মিলনের অভাবেই দেশ এত নিস্তেজ ও শক্তিহীন।

আবার সপ্তদশ শতাব্দীতে এই পথেই "আরমাডার" (Spanish Armada) প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজগুলি আসিয়া জলন্ত অগ্নিময় ছোট ছোট ইংরাজ জাহাজের দ্বারা একান্ত নিপীড়িত ও বিধ্বস্ত হইয়া পরিশেষে বিষম ঝড়ের দ্বারা ভগ্ন ও নিমজ্জিত হয়। ক্যাথলিক্ স্পেনরাজ ফিলিপের বিরুদ্ধে সেই ভীষণ জলযুদ্ধে ইংরাজ পোতাধ্যক্ষও একজন "রোমান ক্যাথলিক" ছিলেন। যদিও ইংলণ্ড নিজে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী। ধর্ম্মের বিভিন্নতার ফল তুচ্ছ করিয়া সে দেশের লোকের পরস্পরের উপর জাতীয়তা হিসাবে এমনই প্রগাঢ় বিশ্বাস।

আসিবার জন্ত ভুবন-বিজয়ী "নেপোলিয়ন" "বলোনে" অনেকগুলি চেপ্টাতলা বিশিষ্ট জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। আবার তার পরেই বীর নেলসন চারিদিক রক্ষা করিয়া "ত্রাফালগার ও বলটিক যুদ্ধে" নেপোলিয়নের ক্ষমতাকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া "সমুদ্রের" উপর ব্রিটনের অসীম ক্ষমতা স্থাপিত করেন।

সে সব দিনে বৃটিশদের বীর পূর্ব্বপুরুষগণ, যথা—হকিন্ হাডসন ড্রেক র‍্যালে প্রভৃতি পোতাধ্যক্ষরা জলে লুটতরাজি করিতেন ও দাস ব্যবসা করিতেন। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার যুদ্ধ ও অর্থসংগ্রহ এই তখন তাঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তারই ফলে তাঁহারা এখন এমন ভুবনবিজয়ী পৃথিবীর রাজা। পরে দাসব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কত কোটী টাকা খরচ করিয়া নিজেরাই আবার রাজ্য হইতে সে দাস ব্যবসা তুলিয়া দিলেন। আমাদের আদিকালের বনবাসে নিষ্কাম নির্ব্বাণ মন্ত্র হইতে ইহাঁদের এই আদি সচেষ্ট ভাবগুলি কত বিভিন্ন। তাই দুটি দেশের এরূপ ভিন্ন ইতিহাস হইয়াছে।

এই এতগুলি অতিশয় রোমহর্ষ ঘটনার এই ক্ষুদ্র স্থানটির সহিত সম্বন্ধ আছে। অধুনা ইহা অন্য কারণে প্রসিদ্ধ। এত বাণিজ্য তরি পৃথিবীর আর কোন পথ দিয়াই যাতায়াত করে না। আর এমন বিশাল রাজত্বও পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

এই সকল স্থান দিয়া যাইবার সময় আমার বারিবার কবি টমসন্ লিখিত, বাল্যজীবনের ইস্কুলপাঠ্য সেই বীরগাথা কবিতাটি মনে হইত।

When Britania first at Heaven's command,
Arose from out the asure main,
This was the charter of her land,

Rule Britania—Britania rules the waves !

Britons never shall be slaves.

অর্থাৎ যখন সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের আদেশে ব্রিটানিয়া দ্বীপটি নীল জলধিগর্ভ হইতে প্রথমেই উঠিল, তখন হইতেই তাহার এই স্বত্ব নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং স্বর্গের দূতেরাও সেই স্বত্ব বারবার গাহিয়া প্রচার করিয়াছিল—

"ব্রিটানিয়া তুমিই এই সমুদ্রের উপর রাজত্ব কর।"

তাই ব্রিটানিয়ার অসীম সমুদ্রের উপর এমন অক্ষুণ্ণ রাজত্ব। এমন জাতি কখনও কাহারও পদানত হইতে পারে না। এ ছন্দটিও যেন মেঘ গর্জ্জনের মত।

ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয় কিরূপ স্বাধীন বলবান জাতির মুখে এইরূপ কথা সাজে। জাপান দ্বীপেরও এইরূপ সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থানের ইতিহাস আছে। বোধ হয় নাতিশীতোষ্ণ দেশের দ্বীপগুলির ওইরূপ বীরপ্রসূধর্ম্ম কতকটা স্বাভাবিক। তেমনি ক্লান্তিকর গ্রীষ্মদেশের চিন্তাপ্রসূধর্ম্মও স্বভাবসিদ্ধ।

উপসংহার।

এতক্ষণ ধরিয়া বিলাতের পথের বর্ণনা করিলাম। প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্য দেশে আসিতে এতগুলি দেশ দিয়া আসিতে হয় যে সে গুলির কথা কিছু কিছু না বলিলে "বিলাত ভ্রমণ" প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হয় না।

এই পথ দিয়া আসিতে আসিতে এই কয়টি কথার স্বার্থকতা বিশেষ করিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে।

প্রথম—এই বিশাল পৃথিবীর যে কত অল্প পরিমাণ স্থান মাত্রতে বসতি

তবে মাঝে মাঝে এক একটি বন্দর পাওয়া যায়। সেগুলি অতিক্রম করিতে এক ঘণ্টা আধঘণ্টা মাত্র সময় লাগে। তার পরই আবার কেবল অনন্ত জলরাশি বা নানা দেশের জনহীন বেলাভূমি।

দ্বিতীয়—ব্রীটেন যে আপনার বিশাল রাজ্য কত সুদৃঢ় ভাবে গড়িয়াছেন—সে কথাও বেশ বুঝা যায়। এত দূরে দূরেও এক একটি এই সকল বন্দর বা পা ফেলিবার ধাপ যেন কেল্লার মত সুরক্ষিত। হাজার দূরত্বেও তাতেই এ বিশাল রাজ্যের শক্তিসামর্থ্যে কিছু আসে যায় না।

তৃতীয়—সুয়েজ খালের এই অপ্রশস্ত ছোট পথটি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধে যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে। ইউরোপের তরুণ জগতের যত শক্তি যত প্রতাপ এই পথেই এখন নির্দ্দেশ করিয়াছে। তাতে মৃত সঞ্জীবনী পাশ্চাত্য নূতন সভ্যতার নূতন আলোক আসার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ভাবের পরিবর্ত্তনও এত দ্রুত আসিতেছে যে সে পরিবর্ত্তনে অক্ষম অতি বৃদ্ধ অতি দুর্ব্বল প্রাচ্য দেশগুলির তাতে অস্তিত্ব অধুনা বড়ই সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে। পৃথিবীর যাবতীয় বলিষ্ঠ জাতির সঙ্ঘাতে আসিয়া তারা বড়ই বিপন্ন।

চতুর্থ—পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশের নিজ নিজ বিশিষ্ট ভাবগুলি ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন হইয়াই পরস্পরে মিশিয়াছে। বিভিন্ন দেশ দিয়া পরে পরে যাইবার পথে দেখা যায়—প্রাচ্যভাব ক্রমে ক্রমে প্রতীচ্য হইতেছে। মিশর ও ইউরোপের দক্ষিণ প্রদেশস্থ দেশগুলি গঠন ও ভাবে অনেকটা প্রাচ্যেরই মত।

পঞ্চম—শীতপ্রধান দেশে যেমন লোকের রং ফরসা হয় তেমনি দেহের গঠন ও মনের ভাবেও বিশেষত্ব জন্মায়। তাহারা আরও মাংসল কর্ম্মঠ ও মনের কর্ম্মোন্মুখী ভাববিশিষ্ট। দেশ ঠাণ্ডা বলিয়া শরীরের ও মনের সকল কার্য্যেরই ধীরে ধীরে উন্মেষ হয়; যথা লোকের যৌবন ও

জাতির সভ্যতা ও বীরত্ব ও বৈষয়িক ভাব। তাই প্রাচ্য দেশেই প্রথমে সভ্যতার বিকাশ হইয়া এখন নূতন পাশ্চাত্য দেশে তাহার আরও শ্রীবৃদ্ধি। ইতিহাসের এ ঘটনা আকস্মিক নহে। এ আবহাওয়া ও প্রকৃতিরই অনিবার্য্য নিয়ম। শীত প্রধান দেশে সকল জিনিষেরই আরম্ভ কিছু দেরীতে কিন্তু স্থিতিকাল আরও বেশী।

ষষ্ঠ—প্রাচ্য দেশ হইতে পাশ্চাত্য দেশের এই আর একটি বিশেষত্ব যে সেস্থানের সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল দ্রব্যেরই "একতার" দিকে গতি। লোকগুলি দেখিতে ও পোষাক পরিচ্ছদে অনেকটা একই রকম। এবং তাদের ভাষায় ও লিখিবার হরফে ও সামাজিক ও রাজনৈতিক রীতিনীতিতে অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। একদিন রোমের অধীনে সবগুলি একত্রে আসিয়াছিল বলিয়া তাদের ভিতর এমন একতা আসিয়াছে। ধর্ম্মও প্রায় একরূপ। এই সকল একতার কারণেই কি অনেকটা ইউরোপের এমন উন্নতি নয়?

সপ্তম—ইউরোপের শেষ বিশেষত্ব—রমণীজাতির স্বাধীন উন্নত অবস্থা। ইউরোপের সহিত আসিয়া প্রভৃতি অন্যান্য দেশের এইটি একটি অতীব মহান প্রভেদ। সেখানে বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ চিরবৈধব্য প্রভৃতি রমণীজাতির উপর অমানুষিক অত্যাচার ও সামাজিক দুর্ব্বলতার কারণ কখনও কোথাও শুনা যায় নাই। রমণীজাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও রাজ্যেরও উন্নতি সমানভাবে চলিয়াছে। জাতীয় উন্নতির অনেক কারণের মধ্যে নিঃসন্দেহ এইটীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ। অধিকাংশ প্রাচ্য দেশই, বিশেষ ভারতবর্ষ এ বিষয়ে চিরকালই অন্ধ।